উপন্যাস

এক জীবনে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

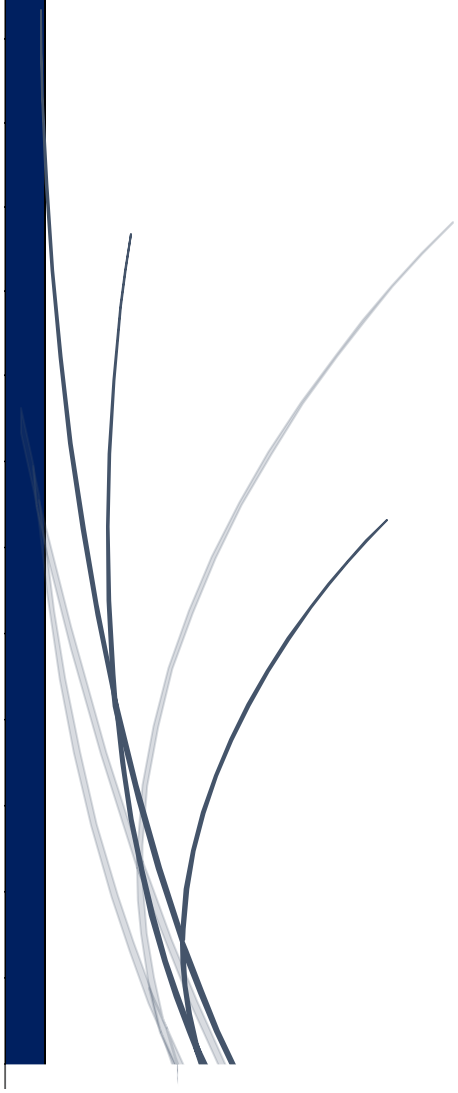

BENGALIEBOOK.COM
বেঙ্গালিইবুক.কম
bengaliebook.com
2021

সূচিপত্র

১. এক পশলা বৃষ্টি.....3
২. বিকেলের দিকে বৃষ্টি.....6
৩. দু-আঙুলে আস্ত সিগারেট 11
৪. সে অনেকদিন আগের কথা 24
৫. সকাল সাড়ে আটটার সময়.....31
৬. ইন্দ্রাণী সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছিল 39
৭. নিশানাথ ঘুম থেকে ওঠেন.....49
৮. আগের রাত্রির অর্ধেক শেষ করা ইংরেজি উপন্যাস.....62
৯. শিলং-এর টুরিস্ট লজের উঁচু রাস্তা.....70
১০. মিনিবাস থেকে নেমে ইন্দ্রাণী 78
১১. নাসিরুদ্দিন প্রথমটা ঠিক বুঝতে পারেনি 88
১২. শিখাদের বাড়িতে অনবরত লোকজন আসে.....99
১৩. মণিকেই আজ বাজারে যেতে হবে.....112
১৪. মণীশকে দেখে ভাস্কর সত্যিকারের অবাক 120
১৫. জীবন ডাক্তার ওই তিনজনের চেহারা দেখে.....129

১৬. তিনতলায় টেলিফোন বাজছে 153
১৭. সঞ্জয় অনেক জিনিসপত্তর এনেছে.....169
১৮. হোটেল থেকে ফিরে আসতে হল ভাস্করকে 178
১৯. উমা বলেছিল, নিশানাথের সঙ্গে কলকাতায় আসবে 188
২০. ইন্দ্রাণীর বাবা-মা.....197
২১. বাড়ি পৌঁছোবার পর সুব্রত 205

১. এক পশলা বৃষ্টি

একটু আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। বাতাসে এখন তাপ নেই। সকাল বেলার আলো স্পষ্ট উজ্জ্বল। পৃথিবী যেন এইমাত্র স্নান সেরে পরিচ্ছন্ন রূপসি হল।

গোটা পৃথিবীটাকে একসঙ্গে খালি চোখে দেখা যায় না। দেখা যায় চওড়া রাস্তা, ডান পাশের গলি, রায়বাড়ির বাগান থেকে ঝুঁকে আসা নারকেল গাছ, একটি ছাদের প্যারাপেটে একঝাঁক শালিক, কিছু ব্যস্ত মানুষ রিকশায়, স্কুলযাত্রী বাচ্চাছেলে।

তিনতলার বারান্দার দরজা খুলে ইন্দ্রাণী বাইরে এসে দাঁড়াল। সে এখন পৃথিবীর এই ক্ষুদ্র অংশটুকু দেখছে। কিংবা তিনতলা থেকে সে আরও খানিকটা দূর পর্যন্ত দেখতে পায়। তাদের বাড়ির বাগানেই তো অনেক গাছপালা।

যদিও ইন্দ্রাণী কিছুই দেখছে বলে মনে হয় না। তার মুখ উদাসিনীর মতন। যেন সে আজ দেরি করে ঘুম থেকে উঠেছে। পিঠের ওপর চুল খোলা, অবিন্যস্ত। সে পরে আছে একটা উজ্জ্বল হলুদ শাড়ি, লাল পাড়। তার ফর্সা শরীর, হলুদ শাড়ি এবং সকালের রোদ, সব মিলিয়ে একটা ম্যাজিকের সৃষ্টি হয়। বলতে ইচ্ছে হয়, রৌদ্রে এসে দাঁড়িয়েছে প্রতিমা।

তিনতলার বারান্দার রেলিং ধরে ঈষৎ ঝুঁকে ইন্দ্রাণীর এই যে দাঁড়িয়ে থাকা, আপাতত পৃথিবীতে এর চেয়ে সুন্দর দৃশ্য আর কিছু নেই। রাজপথ দিয়ে দ্রুত হেঁটে আসতে আসতে সেই দিকে চোখ পড়তেই আমার বুকটা আকস্মিক ভূমিকম্পের মোচড় খায়। দু-এক পলক আমি চোখ ফেরাতে পারি না। নিজেকে আমার মহান ও গ্লানিহীন মনে হয়। সেই মুহূর্তে আমি পৃথিবীর সমস্ত অপরাধীকে ক্ষমা করে দিতে পারি।

ইন্দ্রাণীর হাত দু-টি নিরাভরণ। লাল ব্লাউজের হাতা ওর দুই বাহু যেন কামড়ে আছে। মুখের ওপর পড়েছে চুর্ণ চুল। আজ ইন্দ্রাণী যেন ইন্দ্রাণীর চেয়েও বেশি সুন্দর।

আমি আর একবার ওপরে তাকিয়ে ওর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করি। আর কিছু না। শুধু কী, কেমন আছ, এইটুকু বলার জন্য। কিন্তু ইন্দ্রাণী আমাকে লক্ষ করেনি। অনেক সময় চোখ চেয়ে থাকে, কিন্তু মন চলে যায় অতীত কোনো দৃশ্যে। আমি থমকে দাঁড়িয়ে পকেটে হাত দিই। কয়েকটা খুচরো পয়সা বার করে গুনি অকারণেই। আমার মনের মধ্যে অদ্ভুত এক শান্তি। জীবনে কী এমন করেছি, যার জন্য এতখানি সৌভাগ্য হবে আমার। আজ সকালে এই যে ইন্দ্রাণীকে দেখা! মুনিঋষিরা যে সুন্দরকে দেখতে বলেছেন, এই তো সেই।

রাস্তার মাঝখানে এমন থমকে থাকা যায় না। আমি আবার মন্থরভাবে হাঁটতে থাকি। শেষ কয়েক পলক আবার দেখে নিই ওকে। ও আমাকে দেখতে পায়নি, তাতে কী হয়েছে, আমি তো দেখলাম! ওর ওই রূপের প্রভা আমাকে যেন একমুহূর্তে কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখরের কাছে নিয়ে যায়।

জানি, নারীর রূপ নিয়ে এতটা বাড়াবাড়ি করা অতিরোম্যান্টিকতার কুলক্ষণ। কেউ কেউ বলবেন, এটা আমার রোগ। হতে পারে। আমি নাকি নারীর শুধু রূপটাই দেখি, তার সমগ্র জীবনটা দেখতে পাই না। তাও ঠিক। আমি কী জানি না, রূপসি নারীরাও ঝি-চাকরকে কটু ভাষায় বকে, দোকানে দরাদরি করে, অনেকের বুকের মধ্যে দাউদাউ করে হিংসা, তারা বাথরুমে যায়, তারা সংসারের গাধা, তারাও ফুল ও ফলের মতো ঝরে যায় একদিন? তবু বারান্দার রেলিং-এ একটু ঝুঁকে এই যে হলুদ শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে থাকা– এই দৃশ্যের মধ্যে আর সব কিছু মুছে যায়। তখন আমি স্পষ্ট জেনে যাই, এই নারী আর সকলের চেয়ে আলাদা তখন আমি ওই নারীকে দেখে রূপের চেয়েও আরও বেশি কিছু দেখি। শুধু ওই দিকে তাকিয়ে দুনিয়ার দেখা ও অদেখা শ্রেষ্ঠ দৃশ্যগুলি আমার কাছে চলে আসে। দেখে দেখে আমার আশ মেটে না। আমার লোভ হয় না, বরং আমি প্রেরণা পাই। যেমন ইন্দ্রাণী এইমুহূর্তে আমার মধ্যে এক প্রশান্ত অহংকার জাগিয়ে তুলল। ইন্দ্রাণী আমার কেউ নয়। একসময় সে আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর প্রেমিকা ছিল। ইন্দ্রাণীর চোখে আমার চোখ পড়লে আমি ওর সঙ্গে দু-একটা সামান্য সাধারণ কথা বলতাম মাত্র। তার

চেয়ে ওর নীরবতা আরও মধুর লাগে। একটা অস্থিরতা আমার শরীরে সঞ্চারিত হয়ে যায়। ইন্দ্রাণী তুমি ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকো। আপাতত আমি এই কাহিনি থেকে প্রস্থান করছি।

২. বিকেলের দিকে বৃষ্টি

বিকেলের দিকে বৃষ্টি বেশ জোরে এল। ঠিক পাঁচটার পর। এর নাম অফিস-ভাঙা বৃষ্টি। মধ্য কলকাতার বড়ো বড়ো বাড়িগুলো থেকে পিলপিল করে বেরোচ্ছে মানুষ, এই সময় উঁচু থেকে দেখলে মনে হবে ঠিক যেন একটা পিঁপড়ে-নগরী। ঝমঝম বৃষ্টির জন্য কেউ পথে নামতে পারছে না, গাড়ি-বারান্দার তলাগুলো জমজমাট। একটু পরে অন্ধকার নামবে, সিনেমাগুলো ভাঙবে, তখন ট্রাম-বাসে মানবসভ্যতা কিছুক্ষণের জন্য চোখ বুজে থাকবে।

নিশানাথ প্রতিদিন হেঁটেই বাড়ি ফেরেন। শুধু ট্রাম-বাসের পয়সা বাঁচানোর জন্যই নয়। তাঁর হাঁটার নেশা। বছরে পাঁচ-শো মাইল হাঁটলে নাকি মানুষের হৃদরোগ হয় না। নিশানাথ তার তিনগুণ পথ হেঁটে পাড়ি দেন। এবং তাঁর হৃৎপিন্ডে এখনও যা শক্তি, তাতে একসঙ্গে বোধ হয় তিন চারজন মানুষকে চালাতে পারে।

নিশানাথের বিশাল দেহ, বড়ো বড়ো পা ফেলে তিনি হাঁটছেন। জল-কাদার জন্য ধুতিটা একটু তুলে ধরতে হয়েছে, এজন্য তিনি একটু বিরক্ত। ভুরু দুটো কুঁচকে আছে। নিশানাথের পছন্দ-অপছন্দ অত্যন্ত জোরালো। বিকেল বেলার বৃষ্টি তাঁর পছন্দ হয়নি, সেই জন্যই যেন তাঁর অধিকার আছে আকাশের ওপর রাগ করার। দুপুরে যেমন তিনি রেগে গিয়েছিলেন সমগ্র উকিল জাতির ওপর।

দুপুরে তাঁকে ব্যাঙ্কশাল কোর্টে যেতে হয়েছিল। মাঝেমাঝেই যেতে হচ্ছে। বাড়িওয়ালা বাড়ি ছেড়ে দেওয়ার জন্য মামলা করেছে। উকিলদের কাজই হল তারিখ ফেলা। ভাবগতিক দেখে মনে হয়, আদালতে কোনোদিন কোনো মামলার নিষ্পত্তি হয় না। নিশানাথ চান হাকিমের সামনে নিজে দাঁড়িয়ে স্পষ্টগলায় বলবেন, যেকোনো নতুন বাড়ি নিতে গেলেই অন্তত তিনগুণ ভাড়া বাড়বে। সেই টাকা তিনি পাবেন কোথায়? তাঁর কী

তিনগুণ আয় বেড়েছে? কিন্তু উকিলরা তাঁকে কিছুতেই এই সোজাকথাটা বলতে দেবে না।

বাড়িওয়ালা যদি আগেকার দিনের মতন কয়েকজন লাঠিয়াল পাঠাতো, তাহলে নিশানাথ তাদের সঙ্গে লড়ে গিয়ে নিজের দখল বজায় রাখতে পারতেন। সেটাই তাঁর পক্ষে সুবিধেজনক। তার বদলে এই আইন-আদালত তাঁর ধাতে সয় না। তবু এই কাজও তাঁকেই করতে হবে। ছেলেদের দ্বারা তো কিছু হয় না।

সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউতে প্রায় হাঁটুসমান জল। আটকে গেছে কয়েকটা গাড়ি। ইজের পরা কালো কালো ছেলেরা লাফাচ্ছে, সেই গাড়িগুলোকে ঘিরে। তিনটি কলেজের ছাত্রী শাড়ি ভিজিয়ে হাঁটছে ছপছপ করে। তারা বিরক্ত নয়, এই জলেও খুশি। তাদের পেছনে পেছনে তিনজন যুবক। তারা মুগ্ধ হয়ে দেখছে ভিজে শাড়িতে নিতম্বদেশের ছন্দ।

একটা বাচ্চাছেলে দৌড়ে যেতেই খানিকটা জল লাগল নিশানাথের গায়ে। নিশানাথ ধমকে উঠলেন, এই!

যেন বাঘ ডাকল। ছেলেটা কেঁপে উঠল একেবারে। নিশানাথ ক্রুদ্ধভাবে ছেলেটার ঘাড় ধরলেন। মনে হল, টুঁটি চেপে মেরেই ফেলবেন। কিন্তু কয়েক পলক তাকিয়ে রইলেন শুধু, তারপর ঠাণ্ডাভাবে বললেন, ওরকম করিস না, যা!

হঠাৎ হঠাৎ রাগে মাথায় রক্ত উঠে আসে। বয়েস হয়েছে প্রায় চুয়ান্ন, এখন এতটা রাগ করা উচিত নয়। নিশানাথ সবসময় নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু এই হতচ্ছাড়া শহরে এতবেশি রাগ করার জিনিস আছে!

বউবাজার পেরোবার সময় একটা ট্যাক্সি জলে ঢেউ তুলে নিশানাথের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে একজন ডাকল, নিশি!

অদূরে গিয়ে ট্যাক্সিটা থামল। নিশানাথ কাছে এগিয়ে এলেন। ট্যাক্সিতে বসে আছে দেবেন। অনেকদিন পর দেখা।

দেবেন বললেন, শ্যামবাজারের দিকে যাবি? উঠে পড়।

নিশানাথ বললেন, না, আমি কাছেই যাব। তুই যা।

দেবেন বললেন, আমি এয়ারপোর্টে যাচ্ছি, তুই উঠে আয়, কথা বলা যাবে একটু।

দেবেনের পাশে দুটি স্ত্রীলোক বসে আছে। নিশানাথ সে-দিকে একবার আড়চোখে তাকালেন। তারপর গাড়িটা ঘুরে এলেন সামনে ড্রাইভারের পাশে বসবার জন্য।

কিন্তু গাড়িটা আর স্টার্ট নিল না। ড্রাইভার বিরক্তিসূচক কী যেন বলল। জলের মধ্যে গাড়ি থামানোর সত্যি ঝুঁকি আছে। দেবেন অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে বললেন, সে কী, গাড়ি চলছে না? আর মাত্র পঞ্চাশ মিনিট—তারপর প্লেন ছেড়ে যাবে।

নিশানাথ হেসে ফেললেন। এতক্ষণে তাঁর বিরক্তি কেটে গেছে। মানুষের এই ধরনের অস্থিরতা দেখতে তাঁর ভালো লাগে। তিনি লঘুভাবে বললেন, আমাকে ডাকতে গেলি কেন? সেইজন্যই তো এ-রকম হল।

দেবেন বললেন, যতবার তোর সঙ্গে দেখা হয়েছে, ততবারই একটা-না-একটা বিপদ হয়েছে আমার।

সে-কথা মনে থাকে না কেন?

নিশানাথ এক হাত দিয়ে গাড়িটা ঠেলতে লাগলেন। গাড়ি সেইভাবেই চলতে লাগল, স্টার্ট নেওয়ার কোনো লক্ষণ নেই। নিশানাথ ঠেলেই চললেন, যেন তিনি ঠেলতে ঠেলতেই গাড়িটাকে এয়ারপোর্টে নিয়ে যাবেন।

একটু জল কমার পর ড্রাইভার নেমে এসে গাড়ির হুড খুলল। তারপর খবরের কাগজ জ্বেলে সেঁক দিতে লাগল কারবুরেটারে।

নিশানাথ জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় যাচ্ছিস?

অসমে। জরুরি কাজ আছে।

তোর তো সবসময়ই জরুরি কাজ থাকে।

তা থাকে। তোর মতন শান্তিতে থাকতে পারলাম কোথায়? নিশানাথ স্ত্রীলোক দু-টির দিকে আবার তাকালেন। উগ্র সাজপোশাক। তাঁর একটু সন্দেহ হল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুই কি বিয়ে করেছিস শেষপর্যন্ত?

দেবেন বিরক্তভাবে বললেন, কেন, বিয়ে করতে যাব কোন দুঃখে? তোদের মতন ছেলেপুলে, নাতিপুতি নিয়ে একটা নেটিপেটি জীবন কী আমার সহ্য হবে?

দেবেন সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দিতে নিশানাথ হাত নেড়ে বললেন, না। তিনি যে সিগারেট খান না, সে-কথা দেবেনের মনে নেই। কতদিন দেবেনের সঙ্গে পা ছড়িয়ে বসে কথা হয় না। শুধু রাস্তায়-ঘাটে দেখা। অথচ একসময়, মনে হয় যেন কয়েক যুগ আগে, নিশানাথ আর দেবেন একখাটে শুয়ে রাতের পর রাত কাটিয়েছেন।

মণীশের খবর পেয়েছিস?

আমি তার খবর রাখতেও চাই না।

দেবেন একটু হেসে জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে পুরোনো বন্ধুর বাহু ছুঁয়ে বললেন, তোর মতন গোঁয়ারগোবিন্দ লোকরা পৃথিবীতে চিরকালই কষ্ট পায়।

নিশানাথ বললেন, আমি কষ্ট পাচ্ছি বুঝি? তুই তো সুখে আছিস?

নিশ্চয়ই!

তাহলেই হল!

তুই যদি তখন আমার কথা শুনতিস।

চলি!

গাড়ি স্টার্ট নিয়েছে মনে হচ্ছে। তুই উঠবি না?

না।

আর কিছু না বলে নিশানাথ চলে গেলেন ফুটপাথের দিকে। কুলটা স্ত্রীলোকদের সঙ্গে তিনি এক গাড়িতে বসেন না। কিন্তু দু-জন কেন? সমবয়সি দু-টি মেয়েকে একসঙ্গে নিয়ে দেবেন

কী করছে?

ট্যাক্সিটা চলে যাওয়ার পরও নিশানাথ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। নিজের জীবনের সঙ্গে দেবেনের জীবনের একটু তুলনা না করে পারলেন না। তাঁর মনে হল, দেবেন একটা অর্থহীন জীবন কাটাচ্ছে। এ-রকম মানুষের বেঁচে থাকা, না-থাকা সমান কথা। তবু নিশানাথ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। দেবেনের জন্য না নিজের জন্য ঠিক বোঝা গেল না।

৩. দু-আঙুলে আস্ত সিগারেট

দু-আঙুলে আস্ত সিগারেটটা ধরে কিছুক্ষণ ঘোরাতেই ভেতরের তামাক খসে পড়ে যেতে লাগল। প্রায় সবটা খালি হয়ে আসবার পর অনিন্দ্য তার বাঁ-হাতের চেটোতে রাখা গাঁজার মশলা সেটার মধ্যে ভরতে শুরু করল। অবিলম্বেই সেটা আবার একটা অসমান চেহারার সিগারেটে পরিণত হল।

অনিন্দ্য সেটা ধরিয়ে খুব লম্বা একটা টান দিল, ধোঁয়া চেপে রাখল বুকের মধ্যে। তারপর সিগারেটটা সুব্রতর দিকে বাড়িয়ে চোখের ইশারায় বললে, নে।

সুব্রত বলল, না, আমার দরকার নেই।

অনিন্দ্য এবার দম-চাপা গলায় এক ধমক নিয়ে বলল, নে, না শালা।

মেঝেতে বসে পোস্টার লিখছিল অরবিন্দ, সে বলল, আমায় একটু দিয়ে গুরু!

সুব্রত সিগারেটটা নিয়ে দুর্বলভাবে টানতে লাগল। ধোঁয়া ভেতরে নিচ্ছে না। দু-বার টেনেই সেটা নীচে অরবিন্দর দিকে এগিয়ে দিল। অনিন্দ্য চোখ বুজে ধ্যানী-সন্ন্যাসীর মতন বসে আছে।

সিগারেটটা এ-রকম দু-তিনবার হাত ঘুরতে লাগল। অনিন্দ্য এরই মধ্যে আরও খানিকটা গাঁজার পাতা হাতের তালুতে নিয়ে গুঁড়ো করছে।

একবার একটু ধোঁয়া ভেতরে চলে যেতেই সুব্রত কেশে উঠল। ঘা লেগেছে ব্রহ্মতালুতে, কাশি আর থামেই না। অনিন্দ্য তার মাথায় আস্তে আস্তে চাপড়া মারতে মারতে বলল, সুব্রতটা একেবারে মেয়েছেলের হদ্দ।

অরবিন্দ বলল, ও-কথা বোললা না। ও-কথা বোললা না। মেয়েরাও আজকাল ফাটাচ্ছে! শিখাকে দেখেছ তো? একটানে ফাঁক করে দেয়। তুমিও হেরে যাবে গুরু।

অনিন্দ্য মুখটা বেঁকিয়ে বলল, রাখ তোর শিখার কথা! তুই ঝেড়েছিস?

না, মাইরি।

চান্স পাসনি? অনেকেই তো...

তুমি? সত্যি করে বলো তো...

আমার দরকার নেই। আমি ভাবছি সুব্রতকেই...

অনিন্দ্য সুব্রতর কাঁধে হাত দিয়ে তাকে কাছে টানার চেষ্টা করতেই সুব্রত নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, এই কী হচ্ছে কী?

অরবিন্দ হাসতে লাগল আলজিভ দিয়ে। তারপর চেঁচিয়ে উঠল, যাঃ! দিলি তো। সবটা নষ্ট করে দিলি তো!

সুব্রতর পায়ের ধাক্কা লেগে রঙের কাপটা উলটে গেছে। সুব্রত সঙ্গে সঙ্গে লজ্জিত হয়ে পড়ল। সবসময়েই সে এ-রকম একটা কিছু গোলমাল করে ফেলে। অরবিন্দ বলল, যাক গে, লেখা আমার প্রায় ফিনিশ।

অনিন্দ্যর মুখ লালচে হয়ে গেছে। চোখে একটা ঝিমঝিম ভাব। তৃতীয় সিগারেটটা নিয়ে সে পরম সুখে টানছে। হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, শিখা নাকি অশ্রুবিন্দুর সঙ্গে দিঘা গিয়েছিল?

অরবিন্দ উদগ্রীব হয়ে বলল, তাই নাকি? কে বলল?

সুব্রত বলল, তোরা কী যে সব আজেবাজে বানিয়ে বানিয়ে বলিস! শিখা মেয়েটা ভালো, স্মার্ট, কারুকে বিশেষ পাত্তা দেয় না, সেইজন্যই তোরা...

অপর দু-জন প্রায় একসঙ্গে বলে উঠল, কী রে পিরিত আছে নাকি তোর? চিঠিফিটি লিখেছিস?

অনিন্দ্য বলল, খুলে বল না। অন্যের মালের দিকে আমরা নজর দিই না।

যাঃ, সেসব কিছু নয়। আমি জানি শিখা মেয়েটা ভালো।

আমরাও তো বলছি মালটা ভালো।

তোরা সব মেয়েকেই বুঝি ওইরকম ভাবিস?

অরবিন্দ হঠাৎ রেগে উঠে বলল, আরে ওসব ঝান্ডু পার্টি আমার অনেক চেনা আছে। পরপর চার বার দিলে চোট খেয়েছি। এখন স্রেফ বুঝে গেছি, ধর তক্তা, মার পেরেক। অনেক হাই হাই টক শুনেছি, সেইসব ফোতো কাপ্তেনকে একবার ধুবুড়িয়াবাগানে সাইডিং করে দেখ তো কীরকম খিচে রড দেয়–

বাইরে দরজায় খট খট শব্দ হল। অরবিন্দ চেঁচিয়ে উঠল, কে?

আমি। খোল না।

অনিন্দ্য খাট থেকে তড়াক করে নেমে বলল, দাঁড়া, দাঁড়া, আগে খুলিস না।

ঘরের দেওয়ালে একজোড়া ইলেকট্রিকের তার ঝুলছিল। জ্যান্ত তার। অনিন্দ্য সেই তারজোড়া টেনে এনে সামনের খোলা মুখটা দরজার লোহার হাতলের সঙ্গে ঠেকিয়ে দিল। তারপর বলল, কাম ইন!

ও দিক থেকে সুখময় দরজার হাতল ছুঁতেই শক খেল এবং চেঁচিয়ে উঠল, উরেঃ বাবারে!

ঘরের মধ্যে তিনজন বেদম হাসছে। অনিন্দ্য দরজা খুলে বলল, কীরকম চুপকি দিলাম! সুখময় হাতটা ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, এসি না ডিসি? ওফ!

এসি হলে খোপড়ি উড়ে যেত।

এ-রকম বাজে ইয়ার্কি করিস কেন বল তো! অনিন্দ্যটা...

নিশ্বাসে ঘরের হাওয়ার গন্ধটা নিয়ে সুখময় বলল, গাঁজা টানছিলি নিশ্চয়ই? তোদের নিয়ে আর পারি না। হাতে এত কাজ রয়েছে এখন...

অরবিন্দ জিজ্ঞেস করল, কাল তাহলে পরীক্ষা হচ্ছে না তো?

সুখময় গম্ভীর হয়ে গেল। ঘরের মধ্যে চোখ বুলিয়ে নিল একবার। অনিন্দ্যর সারা ঘরে বইপত্র ছড়ানো। কোর্সের বই ছাড়াও নানা ধরনের বই পড়ে সে। বারট্রাণ্ড রাসেলের আত্মজীবনী, চীন বিষয়ে এডগার স্নো, এমনকী প্লে বয় ম্যাগাজিন পর্যন্ত। সুখময় একটা ভোলা বই বন্ধ করে দিয়ে ভারী গলায় জানালো না! আমরা আলটিমেটাম দিয়ে দিয়েছি। ৮ জুলাইয়ের আগে পরীক্ষা হবে না। পোস্টারগুলো লিখেছিস তো?

সব ফিনিশ।

আজ রাত্তিরেই পোস্টারগুলো মেরে দিয়ে আসবি, না কাল সকালে? তা

রপর সুখময় আর অরবিন্দ গভীর গুরুত্বের সঙ্গে পরীক্ষা বন্ধ করার পরিকল্পনা আঁটতে লাগল। কারা কারা দলে আছে, কারা কারা নেই। দু-একটা রাঙালুমার্কা ভালো ছেলে পরীক্ষা দেবেই বলছে, কিন্তু তাদের ঠাণ্ডা করতে অসুবিধে হবে না। দু-চারবার ধড়কান দিলেই ভয়ে পালাবে। পরীক্ষার আগে ইলেকশানটা করে যেতেই হবে।

অনিন্দ্য আলোচনায় অংশ না নিয়ে চুপ করে বসে আছে। সুব্রত পোস্টারগুলো গুছিয়ে তুলছে। পরীক্ষাটা একটু পিছোননা খুবই দরকার।

সুখময় বলল, অনিন্দ্য তুই-ও দু-একটা পোস্টার লাগাবি তো?

অনিন্দ্য বলল, ছিঁড়ে ফেল।

বাকি তিনজনের কেউ ওর কথার মানে বুঝতে পারল না।

অনিন্দ্য নিজেই ওদের বুঝিয়ে দিল, পোস্টারগুলো ছিঁড়ে ফেল, দরকার হবে না। কাল পরীক্ষা হবে।

তার মানে?

অরবিন্দ বলল, গাঁজার ঝোঁকে কী যা তা বলছ গুরু। কাল পরীক্ষা হবে, বললেই হল? এ কী, ও ঘুড়ি তোর বিয়ে?

অনিন্দ্য হুংকার দিয়ে বলল, আলবত হবে। কালই পরীক্ষা হবে।

সুখময় বলল, জল খা, এক গেলাস জল খা। নেশা তোর মাথায় চড়ে গেছে।

নেশা-ফেশার কথা হচ্ছে না। আমি কাল পরীক্ষা দেব।

নিজে আমাদের উসকে দিয়ে এখন পেছন থেকে ল্যাং মারছিস?

ইউনিয়নের ইলেকশানের আগে পরীক্ষা হলেই হল? নেক্সট ইয়ারে তাহলে আমাদের পজিশানটা কী হবে?

পরীক্ষা হয়ে গেলে নেক্সট ইয়ারে তো আমরা থাকছিই না।

তা বলে ইউনিয়নটা আমাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে?

সে অন্য ছেলেরা বুঝবে! আমাদের কি চিরকাল থেকে যেতে হবে নাকি?

অরবিন্দ কাঁচুমাচু গলায় বলল, ইলেভনথ আওয়ারে এ-রকম মত বদলাবার কোনো মানে হয়? কী করে পরীক্ষা দেব, কোনো প্রিপারেশান নেই—তোমার মতন ব্রিলিয়ান্ট ছেলের তো কোনো অসুবিধে নেই...

হাসাসনি অরবিন্দ, হাসাসনি। পাশ করার জন্য আবার প্রিপারেশান লাগে নাকি? আমি তো ফার্স্ট ক্লাস পাবই। অসুবিধে হবে এই সুব্রতদের মতন মিডিয়োকারদের। ও খেটেখুটে পড়াশুনো করে যা রেজাল্ট করবে, তোরা টুকেও তাই করবি।

সুখময় কঠোরভাবে বলল, ওসব মাকড়াবাজি ছাড়। কাল পরীক্ষা হবে না, বলে দিয়েছি, হবে না।

অনিন্দ্য বলল, আমি কাল পরীক্ষায় বসব। দেখি কোন শালা আমায় আটকায়।

আমরা আটকাব।

আরে যা যা। তোদের মতো ভুক্কার পার্টি আমার অনেক দেখা আছে।

অনিন্দ্য মাথাগরম করিস না মাইরি, তোকে এখনও বলছি...

ভাগ এখান থেকে। মেলা বকবক করিস না, মাথা ধরে যাচ্ছে।

অনিন্দ্য!

আমি কালা নই। চেঁচাবার দরকার নেই।

সুখময় সদর্পে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আচ্ছা, দেখব কাল তোর মুরোদ। চল অরবিন্দ।

অরবিন্দ সুব্রতর দিকে তাকিয়ে বলল, আয়!

অনিন্দ্য সুব্রতর দিকে তাকিয়ে বলল, না তুই থাক।

সুব্রত দোটানায় পড়ে গেল। সে এদিকে-ওদিকে তাকাচ্ছে।

সুখময় জাদুকরের মতন দৃষ্টি দিয়ে সুব্রতকে আবার জিজ্ঞেস করল, কী রে, তুই আসবি না?

অনিন্দ্য ধমক দিয়ে বলল, তোরা যা-না, সুব্রত এখন এখানে থাকবে।

সুখময় চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, কীরে সুব্রত, তুই যে মাগের অধম হয়ে গেলি। ভয় খাচ্ছিস? আসবি না আমাদের সঙ্গে? ঠিক আছে, এমন হুড়ো দেব, বুঝবি পরে–

সুব্রত কোনো কথা না বলে মাঝখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। সুখময়রা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

অনিন্দ্য খাটের তোশকটার এককোণ তুলে আর একটা কাগজের পুরিয়া বার করল। আবার একটা গাঁজা সিগারেট সাজতে লাগল।

সুব্রত চেয়ারে বসে পড়ে বলল, সত্যিই তুই কাল পরীক্ষায় বসতে চাস?

হ্যাঁ, কেন, তুই পরীক্ষা দিবি না?

চার-পাঁচ দিন ধরে তো কিছুই পড়লাম না। তারা সবাই মিলে বললি–

যা আগে পড়েছিস তাতেই হবে।

তোর কথা আলাদা, তুই ভালো ছেলে।

অনিন্দ্য হা-হা করে হাসল। তার হাসিতে সবসময় একটা বিদ্রুপের ভাব থাকে। যেন গোটা বিশ্বসংসারের সবাই নির্বোধ, সে একা দূর থেকে সব কিছু দেখছে।

কাল ওরা গেটে পিকেটিং করবে।

করুক। দেখবি বেশিরভাগ ছেলেই পরীক্ষা দিতে চায়। হুড়মুড় করে ঢুকে গেলে কেউ আটকাতে পারবে না।

আমিও তো পরীক্ষা দিতেই চেয়েছিলাম। কত কষ্ট করে বাড়ি থেকে আমার পড়ার খরচ জোগাচ্ছে, এরপরেও যদি একটা বছর নষ্ট হয়।

অনিন্দ্যর অবশ্য এ সমস্যা নেই। তার বাড়ি বেশ অবস্থাপন্ন। টাকাপয়সার প্রসঙ্গ সে পছন্দ করে না।

সিগারেটটায় শেষটান দিয়ে সে হঠাৎ খাট থেকে নেমে পড়ে বলল, চল।

কোথায়?

শিখার বাড়িতে।

এখন? রাত নটা বাজে।

তাতে কী হয়েছে?

না, আমি এখন বাড়ি যাব।

মেয়েমি করিস না তো! তোর কি বাড়ি ফেরার সময়ের ডেডলাইন আছে নাকি?

কাল পরীক্ষা দিলে আজ একটু পড়তে হবে না?

লাস্ট মোমেন্টে পড়াশুনো করে কেউ দিগগজ হয় না।

তারপরই সে ঘুরে দাঁড়িয়ে সুব্রতর থুতনি ধরে আদর করে বলল, মানতু সোনা! তুই মেয়ে হলি না কেন মাইরি?

লজ্জারুণ মুখে সুব্রত বলল, যাঃ এ-রকম করিস না। আমার ভালো লাগে না।

শিখাদের বাড়ি যোধপুর পার্কে। সারাবাড়ি আলোয় ঝলমল করছে। কে জানে কোন ঘরে শিখা থাকে। শিখাদের বাড়ির ছাদের ওপর যে-আকাশ সেখানে অনেক বেশি তারা। বাড়ির দু-পাশে দু-টি নারকোল গাছ তাদের পাতা নেড়ে নেড়ে বাড়িটিকে হাওয়া দিচ্ছে।

বসবার ঘরে দু-জন প্রৌঢ় বসেছিলেন। একজন শিখার কাকা, অপর জন তাঁর বন্ধু। শিখার কাকা দরজা খুলে দিলেন।

সুব্রত একটু লাজুক চোর চোর ভাব করেই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে। অনিন্দ্য এগিয়ে এসে বলল, শিখা আছে?

একটু থেমে, শিখার কাকার অব্যক্ত কৌতূহল নিবৃত্তির জন্যই সে আবার বলল, আমরা ওর ক্লাসফ্রেণ্ড।

ডেকে দিচ্ছি, ভেতরে এসে বোসো।

শিখার কাকা ভেতরে ডাকতে গেলেন। অপর ভদ্রলোকটি বসে বসে হাঁটু দোলাচ্ছেন। অনিন্দ্য তাঁর দিকে কটমট করে তাকিয়ে রইল। বন্ধুরা সবাই জানে, বুড়ো খচাতে অনিন্দ্য দারুণ ওস্তাদ।

অনিন্দ্য সবসময় তাঁর চোখে চোখ ফেলে রাখায় ভদ্রালোক একসময় অস্বস্তিতে উঠে চলে গেলেন বাইরে। অনিন্দ্য আবার সেই বিদ্রুপ মিশিয়ে হাসল।

শিখার চুলগুলো একবেণি করে বাঁধা। একটা আটপৌরে শাড়ি পরা, মুখে ঘাম। সে বেশ লম্বা, কাটালো নাক ও থুতনি, স্পষ্টচোখ মেলে তাকাতে জানে। ঘরে ঢুকে সে ঝপাং করে একটা সোফায় বসে পড়ে ঈষৎ ঝাঁঝালো গলায় বলল, কী ব্যাপার? তোমরা এখন?

অনিন্দ্যর চোখ দুটো ঢুলু ঢুলু হয়ে এসেছিল। সে বলল, পড়ছিলি?

পড়ব না তো কী করব?

যদি কাল পরীক্ষা শুরু না হয়!

তোমরা বুঝি সেই ঘোঁট পাকাতে এসেছ?

সুব্রত তাড়াতাড়ি বলল, না, না, আমরা জানাতে এসেছি কাল পরীক্ষা হবেই।

শিখা বলল, সে-কথা বুঝি টেলিফোনে জানানো যেত না?

অনিন্দ্য বলল, তবু ইচ্ছে হল, তোমাকে একবার দেখে যাই।

শিখা চঞ্চলভাবে শরীর মুচড়ে বলল, ঠিক আছে, দেখা তো হয়েছে, এবার কেটে পড়ো। আমার অনেক পড়া বাকি আছে।

যতই পড়ো, আমাকে বিট করতে পারবে না!

বুঝেছি! সেইজন্যই বুঝি তোরা আমার পড়া নষ্ট করতে এসেছিস?

সুব্রত বলল, না, না, আমরা এক্ষুনি চলে যাচ্ছি। আমরা শুধু বলতে এলাম, কালকে সুখময়রা পরীক্ষা ভণ্ডুল করার চেষ্টা করতে পারে-কিন্তু আমরা পরীক্ষা দেবই।

সে তোরা না বললেও আমি পরীক্ষা দিতামই। এবার তো পুলিশ গার্ড থাকবে।

অনিন্দ্য জড়ানো গলায় বলল, সেই কথাই তো বলছি, সবাইকে খবর দিতে হবে, সবাইকে তৈরি হয়ে আসতে হবে।

তৈরি হওয়া মানে কী? বোমা-টোমা নিয়ে যাবে নাকি? তাহলেই সেরেছে।

না, না, সে-কথা বলছি না, অন্তত কলম তো নিয়ে যাবে। পরীক্ষা দিতে যাবে, অথচ সঙ্গে যদি কলমটাও না থাকে।

শিখা হেসে বলল, বুঝেছি। এবার ওঠো।

তাড়াচ্ছিস কেন? এক কাপ চা খাওয়াবি?

চা, এতরাত্রে?

কেন, চা খায় না লোকে? মাল তো খেতে চাইনি।

তোদের এইসব কথা শুনে আমার বিচ্ছিরি লাগে।

সুব্রত খুব অস্বস্তি বোধ করল। শিখার সামনে এলেই তার বুকের মধ্যে একটু একটু কাঁপে। শিখাকে তার কত কথা বলার আছে। কিন্তু কিছুই বলা হয় না। শিখা তাকে একদিন কলেজ স্ট্রিট থেকে একটা বই কিনে আনতে বলেছিল, তাতেই সে ধন্য হয়ে গেছে। সে মুগ্ধভাবে তাকিয়ে রইল শিখার দিকে। শিখার ব্রা-র স্ট্র্যাপটা ব্লাউজের বাইরে বেরিয়ে এসেছে, সেটা হাত দিয়ে ভেতরে সরিয়ে দিয়ে শিখা সুব্রতকে বলল, তোমাকে তো আমি ভালো ছেলে বলে জানতাম। তুমিও এইসব খাচ্ছ নাকি? তোমার বন্ধুকে এবার নিয়ে যাও।

সুব্রত বলল, এই অনিন্দ্য, ওঠ।

অনিন্দ্য আর কথা বলতে পারল না। চোখ বুজে চেয়ার থেকে ঢলে পড়ল।

মাটিতেই পড়ত। সুব্রত তাড়াতাড়ি ধরে ফেলল তাকে। শিখাও ধড়ফড় করে উঠে এল। অনিন্দ্যর রক্তবর্ণ চোখ দেখে সে ব্যাপারটা বুঝে ফেলে আন্তরিক দুঃখিত গলায় বলল, কাল পরীক্ষা আর আজও তুই নেশা করেছিস? ছিঃ, তোদের লজ্জা করে না?

কোনোক্রমে সিধে হয়ে বসার চেষ্টা করে অনিন্দ্য বলল, লজ্জা করবে কেন? লজ্জা তো নারীর ভূষণ। তোরই যখন সেই ভূষণ নেই-এই বলে সে শিখার আঁচল খসে-পড়া বুকের দিকে তাকালো। শিখা কঠোরভাবে সুব্রতকে বলল, একে বাড়ি নিয়ে যাও।

তৎক্ষণাৎ অনিন্দ্য, সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে মানুষের মতো সোজা হয়ে বলল, যাচ্ছি। কাল দেখা হবে, রণক্ষেত্রে।

অনিন্দ্যকে খানিকটা এগিয়ে দিয়ে সুব্রত বাড়ি ফিরল রাত সাড়ে দশটায়। তাদের বাড়ি এরমধ্যেই নিঝুম হয়ে পড়ে। শুধু দোতলার খাবার ঘরে মা একা জেগে বসে বসে একটা মাসিক পত্রিকা পড়ছেন।

খুব মৃদুগলায় তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এতক্ষণ কোথায় ছিলি? সুব্রতও খুব আস্তে, প্রায় ফিসফিস করে উত্তর দিল, অনিন্দ্যর সঙ্গে পড়াশুনো করছিলাম।

কাল তোদের পরীক্ষা আরম্ভ না?

হ্যাঁ। সেইজন্যই তো, অনিন্দ্যর কাছে অনেক নোটস আছে, দু-জনে একসঙ্গে না পড়লে–

পরীক্ষায় কোনো গোলমাল হবে না তো?

না, কিছু না।

ভালো করে পরীক্ষা দিস, পাশটা করলে..একটা মানুষ এত খাটছে, কতদিন আর টানবে এত বড়ো সংসারটা...

সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে, তুমি চিন্তা কোরো না।

সুব্রত নিঃশব্দে রুটি-তরকারি খেয়ে যেতে লাগল। একবারমাত্র মুখ তুলে জিজ্ঞেস করল, কোনো চিঠি আসেনি?

মা বললেন, না।

হাত ধুয়ে সুব্রত ওপরে উঠে গেল। তিনতলায় একটিমাত্র ঘর। এই ঘরটা তার একার। আগে এই ঘরটা তার দাদার ছিল, এখন উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে।

ড্রয়ার থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই নিয়ে সে চলে এল ছাদে। সারাদিনে সে তিন-চারটের বেশি সিগারেট খায় না।

রাত্তিরের এই সিগারেটটাই তার সবচেয়ে বেশি প্রিয়। ছাদে পায়চারি করতে করতে সে একা একা কথা বলে।

সুব্রত খেলাধুলো কোনোটাই ভালো পারে না, রাজনীতিতে পিছু হঠে আসা ছেলে, পড়াশুনোয় মাঝারি। বন্ধুরাও যখন-তখন তার মাথায় হাত বুলোয়।

আকাশের দিকে তাকালে নিজেকে আরও ছোটো মনে হয়।

ছাদে পায়চারি করে করে সুব্রত শরীরটাকে চাঙ্গা করে তুলল। আজ সে সারারাত পড়বে। সব বইগুলোতে একবার অন্তত চোখ না বুলেলে চলবে না। পাশটা করতেই হবে। শিখা নিশ্চয়ই এখনও পড়ছে। অনিন্দ্যটা কখন যে পড়ে কেউ জানতে পারে না। লুকিয়ে লুকিয়ে ঠিক কাজ সেরে নেয়।

সিগারেটের শেষ টুকরোটা সে রাস্তায় ছুড়ে ফেলে দিয়ে ঘরে চলে এল। ল্যাম্পের বইটা খুলে সবেমাত্র লাল দাগ দেওয়া জায়গাগুলো খুঁজতে শুরু করেছে, এমন সময় আলো নিবে গেল। বিদ্যুৎ বন্ধ।

বইটা টেবিলের ওপর ছুড়ে দিয়ে সুব্রত বলল, ধুর শালা!

এখন আবার মোমবাতি খুঁজতে হবে। মোম খোঁজার বদলে সে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল চেয়ারে। তারপর হঠাৎ ক্রুদ্ধভাবে প্যান্টের বোতামগুলো খুলে চেপে ধরল নিজের পুরুষাঙ্গ। এবং যাবতীয় মোহময়ী চিত্রতারকাদের কথা চিন্তা করতে লাগল খুব মন দিয়ে। একটু বাদেই তাদের সকলেরই মুখ হয়ে গেল শিখার মতন।

৪. সে অনেকদিন আগের কথা

সে অনেকদিন আগের কথা, যখন ওলন্দাজ যোদ্ধা-ব্যবসায়ীরা বঙ্গোপসাগর থেকে গঙ্গা নদী ধরে ভেতরে চলে এসে নদীর ধারে ছোটো ছোটো বসতি করেছিল। তাদের আগেই এসেছিল পোর্তুগিজরা, তারপর ফরাসি, ইংরেজ, দিনেমার। এদেশে লুঠের বখরা নিয়ে তারা নিজেরা প্রায়ই মারামারি করত বলে কয়েকটা ছোটোখাটো দুর্গও তাদের বানাতে হয়েছিল।

সেরকম দু-একটা দুর্গ ভগ্ন অবস্থায় হলেও এখনও টিকে আছে। গাঁয়ের লোকেরা যাকে আন্দাজগড় বলে, সেটা আসলে ওইরকম একটি ওলন্দাজদের গড়। ধু-ধু করা মাঠের মধ্যে অনেক দূর থেকে দেখা যায় গড়টাকে। দেওয়াল ফাটিয়ে বড়ো বড়ো বট-অশ্বত্থ গজিয়েছে, জায়গাটা বেশ দুর্গম, কিন্তু ভেতরের সিঁড়িটা অক্ষত রয়ে গেছে আজও। কোনোক্রমে ওপরে উঠতে পারলে দেখতে পাওয়া যায় বহুদূর পর্যন্ত নদীর বিশাল বিস্তার। বড়ো সুন্দর সেই দৃশ্য। এ অঞ্চলে এত উঁচু বাড়ি আর তো নেই।

হাতে একটা মস্তবড়ো কাটারি নিয়ে সেই ভাঙা গড়ের অদূরে চিন্তিতভাবে দাঁড়িয়েছিলেন জীবন ডাক্তার। কয়েকদিন ধরে তিনি গড়টাকে নিয়ে একটা দোটানায় পড়েছেন।

এক-একবার তিনি ভাবছেন, গড়টাকে একেবারে ভেঙে ধুলোয় মিশিয়ে দিলে কেমন হয়? এর বড়ো বড়ো পাথরগুলোকে নিয়ে বাঁধ বাঁধার কাজে লাগালে নোনা জল আটকানো যেতে পারে। এ-রকম একটা বেঢপ জিনিস থাকার দরকারই-বা কী?

গড়টার জন্য উৎপাতও কম হয় না। অতিরিক্ত সাহসী চাষার ছেলে বা রাখালেরা এখানে আসে মাঝে মাঝে। ভেতরটা একেবারে সাপখোপের বাসা। গত এক বছরে এখান থেকেই তিনটি সাপে কাটা কেস গেছে জীবন ডাক্তারের কাছে। গত সপ্তাহেই তো একটি জোয়ান ছেলে এসেছিল, তাকে বাঁচানো গেল না।

ছেলেটির যন্ত্রণাকাতর মুখখানা এখনও তার চোখে ভাসে। বড্ড দেরি করে ফেলেছিল তাকে আনতে। সামনের মাসে ছেলেটির বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। মৃত্যু হঠাৎ এসে বড় চমকে দেয়। জীবন ডাক্তারের ধারণা, এটা মৃত্যুর একটা রসিকতা তাঁর সঙ্গে। ছেলেটিকে বাঁচাতে না পেরে, তিনি খুবই রেগে গিয়েছিলেন।

শোনা যায়, রাতের অন্ধকারে কিছু লোক এখানে অসভ্যতা করতেও আসে। তারা সাপখোপের ভয়ও মানে না। আশ্চর্য এই গাঁয়ের মানুষগুলো। এখানে আসবে অথচ একবারও কেউ চেষ্টা করবে না জায়গাটা একটু পরিষ্কার করার। সাপ-টাপ মারার উৎসাহও কারুর নেই। একজন মরবে, তারপর দু-তিন মাস কেউ ভয়ে আসবে না, আবার সব ভুলে গিয়ে আর একজন মরতে আসবে।

এতকালের পুরোনো একটা জিনিসকে একেবারে ভেঙে না ফেলে একটু সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখাই যে ভালো, সে-কথাও ভেবেছেন জীবন ডাক্তার। কিন্তু কে করবে? কারুর মাথাব্যথা নেই। তিনি নিজে করতে পারেন। কিন্তু যে-ই জায়গাটাকে মোটামুটি পরিষ্কার আর নিরাপদ করে তুলবেন, অমনি অন্যরা আসবে অধিকার ফলাতে।

তার চেয়ে বোধ হয় ভেঙে ফেলাই উচিত। ভাঙতে গেলে কেউ বাধা দিতে আসবে না। কতৃপক্ষ হয়তো এটার অস্তিত্ব সম্পর্কেই সচেতন নয়।

দূরে একটা রাখাল ছেলেকে দেখে জীবন ডাক্তার ডাকলেন। ছেলেটি গা মোচড়াতে মোচড়াতে একটু কাছে এগিয়ে এসে বলল, কী?

জীবন ডাক্তার বললেন, চল, আমার সঙ্গে ওই গড়টার মধ্যে যাবি?

কেন?

ওর ভেতরটা একটু দেখব।

জীবন ডাক্তারের আগে ছেলেটা নিজেই এগিয়ে গেল খানিকটা। বিশেষ কোনো পথ নেই। আসশ্যাওড়ার ঝোপঝাড় ঠেলে ভেতরে ঢুকতে হয়। জীবন ডাক্তার হাতের কাটারিটা দু-দিকে চালিয়ে জঙ্গল সাফ করতে লাগলেন।

ছেলেটা গড়টার দরজার কাছে পৌঁছে গেছে ততক্ষণে। ভেতরে উঁকি মেরে চেঁচিয়ে বলল, হুস, যাঃ, যাঃ, মা মনসা জল খাও, বাপের মাথায় তাগা দাও, মা মনসা জল খাও।

জীবন ডাক্তার কাছে এসে বললেন, কী? কী হয়েছে?

ভেতরে যদি সাপ থাকে?

তুই দেখেছিস?

না দেখিনি। কিন্তু ওরমধ্যে অজগর সাপ আছে।

দুর পাগল! অজগর সাপ আসবে কোথা থেকে?

নদীর জলে ভাসতে ভাসতে এসেছে। ওমর শেখ নিজের চোখে দেখেছে। প্রত্যেক শনিবারে বেরোয়।

জীবন ডাক্তার একটু হাসলেন। এইভাবেই উপকথার জন্ম হয়। এরপরে হয়তো শোনা যাবে, ওরমধ্যে এমন গোপন সুড়ঙ্গ আছে, যা দিয়ে পাতালপুরীতে যাওয়া যায়। কিংবা ওখানে আছে গুপ্তধন, ওই অজগর সাপটা বসে বসে পাহারা দিচ্ছে।

তুই অজগর সাপ দেখেছিস কখনো? ছেলেটা দু-হাত ছড়িয়ে বলল, এই এত মোটা।

চল, দেখি গিয়ে সাপটাকে।

দাঁড়ান ডাক্তারবাবু, একটা লাঠি নিয়ে আসি।

ছেলেটা দৌড়ে চলে গেল। রোদ্দুর ছড়ানো মাঠের মধ্যে তার কালো শরীরটা দেখা গেল খানিকক্ষণ, তারপর মিলিয়ে গেল আমবাগানের ওপাশে। জীবন ডাক্তার একা দাঁড়িয়ে রইলেন।

ছেলেটা কিন্তু আর এল না। একটা লাঠি জোগাড় করে আনার জন্য যতটা সময় লাগা দরকার ছেলেটা তার দ্বিগুণ সময়ের মধ্যেও ফিরল না।

অপেক্ষা করে করে বিরক্ত হয়ে পড়লেও খুব বেশি অবাক হলেন না জীবন ডাক্তার। গাঁয়ের লোকগুলো এইরকমই, অলস, ফাঁকিবাজ, মিথ্যুক! জীবনে কোনো দুঃসাহস নেই, ঝুঁকি নেওয়ার কোনো ইচ্ছে নেই। ছেলেটা স্রেফ মিথ্যেকথা বলে কেটে গেল।

জীবন ডাক্তার তারপর ভাবলেন, তিনিই-বা এতক্ষণ দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? মনের খুব ভেতরের একটা জায়গায় তিনিও ভয় পেয়েছেন। অজগরের কথা শুনে? বন্যার সময় কখনো কখনো পাহাড়ি সাপ ভেসে আসে, কিন্তু এতদূরে, গঙ্গার মোহানা পর্যন্ত নিশ্চয়ই পৌঁছোবে না। অনেকের ধারণা, সমুদ্রেও নাকি অজগর সাপ থাকে। পৌরাণিক কাহিনির ছবিতে যেমন দেখা যায়। সব বাজেকথা।

সাধারণ সাপকেও ভয় পাওয়ার কিছু নেই। জীবন ডাক্তার কখনো ভয় পাননি। তিনি নিজের হাতে সাপ ধরতে পারেন। আসলে একাকিত্বের জন্য অস্বস্তি। সঙ্গে যদি ওই বাচ্চাছেলেটাও থাকত। তারপরই জীবন ডাক্তার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। আজ যদি তাঁর নিজের একটা ছেলে থাকত! একসঙ্গে কত কাজ করতে পারতেন। পর পর চারটি সন্তান জন্মে মারা গেছে। জীবন ডাক্তারের শরীরে বিষ আছে, তাঁর কোনো বংশধর থাকবে না। তিনি নিজে যে এখনও বেঁচে আছেন সেটাই বিস্ময়ের।

কয়েকটা শুকনো ডালপালা আর পাতা এক জায়গায় জড়ো করলেন জীবন ডাক্তার। পকেট থেকে টিনের লাইটারটা বার করে তার থেকে খানিকটা পেট্রোল ঢেলে দিলেন সেগুলোর ওপর। এবং আগুন জ্বালিয়ে দিলেন।

আগুনটা ভালোমতন ধরবার পর তিনি জ্বলন্ত ডাল পাতাগুলোকে কাটারিটা দিয়ে ঠেলে ঠেলে ঢুকিয়ে দিতে লাগলেন ভেতরে। সাপেরা আগুনের তাপ সহ্য করতে পারে না, বেরিয়ে আসবেই। কিছুই বেরোলো না দেখে তিনি ভেতরে পা বাড়ালেন।

সঙ্গে সঙ্গে এমন বিকট একটা আওয়াজ হল যে, জীবন ডাক্তার আতঙ্কে একেবারে লাফিয়ে উঠেছিলেন। শরীরটা এক নিমেষে এমন দুর্বল হয়ে গেল, যেন বাইরে বেরিয়ে আসারও আর শক্তি নেই। কোনোক্রমে শব্দ লক্ষ্য করে ওপর দিকে তাকিয়ে দেখলেন, একটা স্তম্ভের ওপরে একজোড়া জ্বলন্ত চোখ। অত্যন্ত রাশভারী ভঙ্গিতে বসে আছে একটি ভূতুম পেঁচা।

ভয়েরও একটা নেশা নেশা ভাব আছে। ইচ্ছে করে অনেক সময় ভয় পেতে ভালো লাগে। জীবন ডাক্তার ভাবলেন, পেঁচা না হয়ে আর একটা সাংঘাতিক কিছু হলেও মন্দ ছিল না। অন্ধকারে ভূতুম পেঁচার চোখ দেখলে ভয় লাগে ঠিকই, কিন্তু পেঁচা মানুষের তো কোনো ক্ষতি করতে পারে না! ঠিক যেমন এক ফরাসি বৈজ্ঞানিক চোখের সামনে শয়তানকে দেখে বলেছিলেন, যেহেতু তোমার মাথায় শিং এবং পায়ে ক্ষুর আছে, সুতরাং তুমি নিরামিষাশী, তোমাকে আমার ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

মাঝে মাঝে থাম বসানো বড়ো একটা চত্বরের মতন জায়গা। দারুণ মোটা মোটা দেওয়াল। এটা ভেঙে ফেলা একা জীবন ডাক্তারের সাধ্য নয়। দেওয়ালের গায়ে নানাধরা দাগ দেখে মনে হয়, কখনো কখনো গঙ্গায় জল বাড়লে গড়টার অনেকখানি অংশ ডুবে যায়। পুরোনো অধিবাসীদের কোনো চিহ্নই নেই এখন। শুধু একটা দেওয়ালে-গাঁথা আংটার সঙ্গে ঝুলছে খানিকটা মোটা শিকল। ওই শিকলটা কী কাজে লাগত কে জানে! গুপ্তধনের গুজবটা কেন যে ছড়ায়নি এখনও কে জানে!

জ্বলন্ত ডাল ছুড়ে ছুড়ে তিনি পেঁচাটাকে উড়িয়ে দিলেন। কোনো ক্ষতি করতে পারবে না বটে, কিন্তু মাথার পেছনে বসে ওটা ড্যাবডেবে চোখে তাকিয়ে থাকবে, এটা মোটেই ভালো লাগে না। পেঁচাটা খুব বিরক্তির সঙ্গে উড়ে গেল।

চত্বরটার মাঝখান দিয়ে উঠে গেছে একটা ঘোরানো সিঁড়ি। জীবন ডাক্তার সাবধানে এগোলেন সেই দিকে। ভেতরে আগাছা জন্মালেও মাঝে মাঝে পরিষ্কার করা আছে। আড্ডাধারীরা এসে এখানেই বসে। কী জানি, সেই ছেলেটা এ-রকম কোনো জায়গাতেই মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করেছিল কি না!

দেওয়ালের বাঁধুনি দেখলে বোঝা যায়, একটু সারিয়ে নিলে গড়টা আরও অনেকদিন মজবুত থাকবে। বেশ ভালো একটা বেড়াবার জায়গা হয়। ইউরোপ হলে এইরকম জায়গায় হোটেল হত। দূর দূর থেকে গাড়ি হাঁকিয়ে লোকে খেতে আসত এখানে।

সিঁড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে ওপরে উঠতে লাগলেন জীবন ডাক্তার। সিঁড়ির দেওয়ালের মাঝে মাঝে ফোকর। সেই ফোকর দিয়ে গঙ্গা দেখা যায়। মেঘলা দিন বলে বড়ো বড়ো ঢেউ উঠছে। একসময় নিশ্চয়ই এই ফোকরে বন্দুক খুঁজে পাহারা দিত ওলন্দাজ প্রহরীরা।

একা একা সেই নির্জন গড়ের মধ্যে নিজেকে তাঁর কোনো অভিযাত্রীর মতন মনে হল। যেন তিনি একটা নতুন জায়গা আবিষ্কার করতে এসেছেন। শরীরের কোনো অংশ দুর্বল নয়, বেশ যেন ঝকঝক ফিটফাট। শরীরটাকে এতখানি সুস্থ দেখে তিনি নিজেই অবাক হয়ে যান। এখন সামনে কোনো শত্রু এলে তিনি অনায়াসে তার ওপরে কাটারি চালিয়ে দিতে পারবেন। তাঁর একমাত্র শত্রুর নাম মৃত্যু।

ওপরের ছাদটা পুরু শ্যাওলায় ঢাকা। ঠিক যেন একটা গালিচা পাতা আছে। সেখানে পা দিয়েই জীবন ডাক্তারের সাবধানি চোখ দেখে ফেলল সাপ। প্রথমে তিনি ভেবেছিলেন একটা সাপের দুটো মাথা। সঙ্গে সঙ্গে ভুল ভাঙল। দুটো গোখরো সাপ পরস্পরকে পাকিয়ে রয়েছে।

ডান হাতের কাটারিটা উঁচু করে ধরে জীবন ডাক্তার অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। দুর্লভ দৃশ্য। একে বলে শঙ্খ লাগা। সাপের রতিক্রীড়া।

আপনা থেকেই যেন বেরিয়ে এল, মা নিষাদ। জীবন ডাক্তার সাপ মারতেই এসেছেন, কিন্তু যতই বিষাক্ত শত্রু হোক, সংগমরত এই সাপদের কী মারা যায়? সাপ দুটো অসহায়

অবস্থায় আছে, তিনি ইচ্ছে করলেই এখন ওদের ফণা দুটো থেঁতলে দিতে পারেন।

কিন্তু উঠল না। জীবন ডাক্তার চুপ করে দেখতে লাগলেন সেই দৃশ্য।

৫. সকাল সাড়ে আটটার সময়

সকাল সাড়ে আটটার সময় মনে হল, সুব্রতর একটা কিছু গন্ডগোল রয়েছে। পরীক্ষার কয়েকদিন ধরেই সে ভোর বেলা জেগে উঠে পড়তে বসছিল। ঠিক ছ-টার সময় তার চা দরকার। আজ সকালে মা তিন বার চা নিয়ে ফিরে এসেছেন। সুব্রত জাগেনি। হয়তো সারারাত জেগে পড়েছে, এইকথা ভেবে বেশি ডাকাডাকি করেননি তিনি, কিন্তু সাড়ে নটার সময় যে পরীক্ষা দিতে বেরিয়ে যাবে সে সাড়ে আটটাতেও জাগবে না, এ কী করে হয়।

স্বামীকে কিছু বলতে সাহস পান না। এক ছেলের ব্যাপারেই তাঁর শিক্ষা হয়ে গেছে। বাপ ছেলের কী সাংঘাতিক ঝগড়া, যেন দুই ক্রুদ্ধ দৈত্য। সেই ছেলে সেই যে বাড়ি ছেড়ে চলে গেল, আর ফিরল না। এ ব্যাপারটাও তিনি মুখ বুজে সহ্য করেছিলেন, স্বামীকে কখনো গঞ্জনা দেননি। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, এই সমস্ত পুরুষের পুরষকারের কাছে স্নেহ-মমতার দাম খুব বেশি নয়। কিন্তু সুব্রতকে তিনি আড়াল করে রাখতে চান।

মেয়ে বাসন্তী কয়েকদিন হল বাপের বাড়িতে এসে আছে। বাসন্তীর ছেলে মণিময় বেশ চটপটে। মা বাসন্তীকে বললেন, দেখ তো খোকনের কী হয়েছে?

জানলাটাও ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। মণি খড়খড়ির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে ছিটকিনিটা খুলে ফেলল অতিকষ্টে। জানলা দিয়ে দেখা গেল, বিছানার ওপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে সুব্রত। সেই শুয়ে থাকার ভঙ্গি দেখলেই ভয় হয়।

দরজা ভাঙতে গেলে খুব শব্দ হবে। নিশানাথকে এক্ষুনি কেউ কিছু জানাতে চায় না। মা আর বাসন্তী ব্যাকুলভাবে ডাকতে লাগলেন সুব্রতর নাম ধরে। মণি এক মগ জল এনে জানলা থেকে ছুড়ে দিল ভেতরে। সুব্রতর ঘুম তো এত গাঢ় নয়!

মণিই একটা বুদ্ধি বার করল। পাশের বস্তিতে কয়েক ঘর ছুতোর মিস্ত্রি থাকে। তাদের একজনকে ডেকে যদি দরজাটা বাইরে থেকে খুলে ফেলা যায়।

নিশানাথ তখন বাথরুমে। সেইফাঁকে মণি ছুতোর মিস্ত্রি ডেকে আনল। মা কাঁদতে বসে গেছেন, কিন্তু শব্দ করতে পারছেন না। মণিই তাকে সান্ত্বনা দিল, দিদু, তুমি ঘাবড়াচ্ছ কেন? ছোটোমামু নিশ্চয়ই অজ্ঞান হয়ে গেছে। ক-দিন ধরেই পেটে ব্যথা হচ্ছিল, তুমি জানো না? বাসন্তী তখনও জানলার শিক ধরে পাগলের মতন চেঁচিয়ে যাচ্ছে, এই খোকন, খোকন ওঠ, এই খোকন, খোকন–

ঘ্যাস ঘ্যাস করে করাত চালিয়ে ছুতোর মিস্তিরি যখন দরজায় খানিকটা গর্ত করে ফেলেছে, সেই সময় নিশানাথ পেছনে এসে দাঁড়ালেন। শুধু একটা তোয়ালে পরা, ভিজে গা, মাথার চুল থেকে জল পড়ছে টপটপ করে।

বিস্মিতভাবে জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে?

কেউ কোনো উত্তর দিল না।

জানলা দিয়ে একবার উঁকি মেরেই তিনি ব্যাপারটা আন্দাজ করলেন। কঠোরভাবে বললেন, তোমরা কী পাগল? আমাকে ডাকতে পারনি?

দড়াম দড়াম করে দরজায় লাথি মারতে লাগলেন নিশানাথ। চার-পাঁচটি তাঁর সেই রাম লাথিতেই দরজার খিল খুলে পড়ল। সকলে হুড়মুড় করে ঢুকে এল ভেতরে। মা দৌড়ে সুব্রতর মাথাটা কোলে তুলে নিলেন, বাসন্তী চোখের পাতা টেনে খুলল, কী ঠাণ্ডা সুব্রতর গা।

নিশানাথ সকলকে ঠেলে সরিয়ে সুব্রতর শরীরটা বিছানা থেকে তুলে কাঁধের ওপর নিলেন। মা এবার শব্দ করে ডুকরে কেঁদে নিশানাথের জানু চেপে ধরে বললেন, ওগো, তুমি ওকে কিছু বোলো না, ওকে কিছু কোরো না।

মণি ততক্ষণে ছুটে গেছে পাড়ার ডাক্তারের কাছে। তিনি বললেন, আগে অ্যাম্বুলেন্সে ফোন করো। আচ্ছা দাঁড়াও, আমিই দেখছি।

বাসন্তী ইতিমধ্যে খাটের তলা থেকে বার করেছে ঘুমের ওষুধের শিশি। টেবিলের ওপর একটা প্যাডে সুব্রত কিছু লিখেছিল আবার খুব যত্ন করে কেটে দিয়েছে। আত্মহত্যা করার আগে শেষ চিঠির ভাষাটা সে খুঁজে পায়নি।

অ্যাম্বুলেন্স এসে পৌঁছোবার আগে নিশানাথ ছেলের শরীরটা কাঁধে নিয়ে এসে রাস্তায় দাঁড়িয়েছেন। মুখটা রাগে থমথমে। তখনও তোয়ালে পরা, খালি গা। কেউ তাঁর সঙ্গে একটাও কথা বলতে সাহস করছে না। শুধু মণি তার দিদিমার কানে কানে বার বার শোনাচ্ছে, এখন প্রাণ আছে, ডাক্তারবাবু বলেছেন।

সেই অবস্থাতেই নিশানাথ হাসপাতালে চলে এলেন। এমারজেন্সি বিভাগের ডাক্তারের হাত চেপে ধরে ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি শুধু বলুন। বাঁচবে কি না!

খালি-গা একটি লোকের ভিজেহাতের স্পর্শ ডাক্তার পছন্দ করলেন না। হাতটা ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলেন। পারলেন না। বজ্রমুষ্টি।

তখন তিনি হেসে বললেন, হাতটা ছাড়ন, না-হলে দেখব কী করে?

হাসপাতালে ছত্রিশ ঘণ্টা যুদ্ধ চলল সুব্রতর প্রাণটা টিকিয়ে রাখার জন্য। পাম্প করে তার পেট থেকে কিছু বার করে ফেলা হয়েছিল, কিন্তু তারপরেই সে এমন দুর্বল হয়ে পড়ে যে যেকোনো সময় কোলাপস করতে পারে।

সুব্রত যখন হাসপাতালে অচৈতন্য, সেই সময়ই, বিকেল বেলা নিশানাথ জানতে পেরে গেলেন যে, তাঁর ছেলে আগের দিন পরীক্ষার সময় টুকতে গিয়ে ধরা পড়েছিল। এইসব খবর ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার লোকের অভাব হয় না।

ব্যাপারটা ঘটেছিল এইরকম। অনিন্দ্য আর তার দলবলের চাপে পরীক্ষা ঠিকমতনই শুরু হয়েছিল। অরবিন্দ সুখময়রাও বাধ্য হয়েছিল পরীক্ষার বসতে। তারা এমন সাড়ম্বরে টোকাটুকি শুরু করে দিল যে মনে হল, ওরা সব কটা পরীক্ষাই দেবে।

সুব্রত একটু ভীতু, সে বেশি টুকতে সাহস করে না। আবার, অরবিন্দরা বই এগিয়ে দিলে সেটা ফিরিয়ে দেওয়ারও সাহস নেই।

বাইরের ভাড়া করা গার্ড দু-জন সর্বক্ষণ চোখ বুজে বসে থাকে।

অনিন্দ্যর সিট পড়েছে অন্য ঘরে, সুব্রত যদি সেই ঘরে থাকত, তা হলে সে, সেই দলেই ভিড়ে যেত। অনিন্দ্য টোকে না, তার দরকার হয় না। সুব্রত অরবিন্দদের ঘরে থাকায় সে ওদের সঙ্গে মিশে টোকাটুকি চালিয়ে যেতে লাগল। তাকে পাশ করতেই হবে।

দু-দিন ঠিকঠাক কেটে গিয়েছিল। তৃতীয় দিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হঠাৎ একদল পরিদর্শক এসে যায়। গার্ড দু-জন তখন হঠাৎ তৎপর হয়ে ওঠে, কয়েকজনের কাছ থেকে খাতা কেড়ে নেয়। সুব্রতর কাছ থেকে খাতা কাড়তে এলে সে বিমূঢ় হয়ে যায়, চোখে জল আসে তার। কিন্তু অরবিন্দ সুখময়দের চোখে জল আসে না। অরবিন্দ গার্ডকে বলে, চোপ শালা! তারপর নিজের খাতাটা আবার ছিনিয়ে নেয়। সুখময় হাইবেঞ্চের ওপর লাফিয়ে উঠে বলে, শুয়োরের বাচ্চা, আমার খাতায় হাত দেবে তো, সব ঘুনচট করে দেব। বাপের নাম বৃন্দাবন করে দেব শালা!

হলের মধ্যে একটা লণ্ডভণ্ড কান্ড শুরু হয়ে যায়। যাদের খাতা কাড়া হয়েছিল তারা আবার খাতা ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য ঝটাপটি শুরু করে। সুব্রতও ভেবেছিল, এই সুযোগে সেও যদি খাতাটা ফেরত নিতে পারে, তাহলে বেঁচে যাবে। সে যখন তার খাতা নিয়ে টানাটানি শুরু করেছে, ঠিক সেই সময়েই সুখময় একজন গার্ডকে ঘুসি মেরেছে এবং পরক্ষণেই সেখানে পুলিশ ঢুকেছে। সুখময় অনায়াসেই পালিয়ে যেতে পারে এবং সুব্রতর সঙ্গে আর কয়েকটি অপেক্ষাকৃত কাঁচা ছেলে ধরা পড়ে খুব স্বাভাবিকভাবেই।

পুলিশ অবশ্য ওদের থানায় নিয়ে যায় না। এসব ক্ষেত্রে যা নিয়ম, গাড়ি করে খানিকটা দূরে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেয়। ততক্ষণে সুব্রতর আবার পরীক্ষা হলে ঢোকবার পথ বন্ধ হয়ে গেছে।

বিকেল বেলা তাকে অনিন্দ্য বলল, যদি আর-এ না করে তাহলে একটা পেপার গেলেও তুই পরে ব্যাক পেয়ে যাবি, কাল থেকে আবার পরীক্ষা দিয়ে যা। সুখময়রা বলল, দেখব কাল পরীক্ষা দেয় কোন শালা। একদম ধুলো উড়িয়ে দেব না! কাল থেকে পরীক্ষা বন্ধ থাকবে।

অনিন্দ্য বলল, কেন বন্ধ থাকবে? আর কোনো সেন্টারে গোলমাল হয়নি!

সুখময় বলল, আমি বলছি বন্ধ থাকবে। আলবত থাকবে। সব সেন্টার বন্ধ করে দেব।

অনিন্দ্য তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, যা, যা! তোর মুরোদ জানা আছে আমার।

সুখময় তেড়ে ঘুসি মারতে গেল অনিন্দ্যকে। অনিন্দ্য স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থেকে খপ করে ধরে ফেলল সুখময়ের হাত। তারপর বলল, দেব মুচড়ে?

বেশ ভিড় জমে গেছে। দেখা গেল, অনেকেই অনিন্দ্যর দলে। পরীক্ষা এমনিতেই সাত মাস পিছিয়ে আছে। বেশিরভাগ ছাত্রই এখন নিঝঞ্ঝাটে টোকাটুকি করে পরীক্ষাটা দিয়ে দিতে চায়। পরিদর্শকরা যখন এসেছিল, তখন সুখময়রা একটু চুপচাপ থেকে গেলেই তো পারত।

সুখময়ের নিজস্ব দলবল তখন সেখানে নেই। সে শাসিয়ে গেল, আচ্ছা কাল দেখে নেব। তোদের মতন ভালো ছেলের আমি ইয়ে যদি না মারি, তাহলে আমার নাম সুখময় বিশ্বাস নয়?

সুখময় সুব্রতর হাত ধরে টানল। সুব্রতর জামা ছিঁড়ে গেছে। ছাত্র ইউনিয়নগুলোর কাছে। সুব্রতকে নিয়ে গিয়ে দেখাতে হবে যে, তার ওপর পুলিশি অত্যাচার হয়েছে। যদি একটা স্ট্রাইক ডাকা যায়।

সুব্রতকে নিজের স্বার্থেই সুখময়দের দলে যেতে হল। এখন পরীক্ষা দিলেও সুব্রত পাশ করতে পারবে না। অনিন্দ্য তো দিব্যি বেরিয়ে যাবে।

সুখময়রা ঘুরতে লাগল দলবল সংগ্রহ করতে। চায়ের দোকানে, কফি হাউসে, বিভিন্ন পার্টি-অফিসে ছাত্রনেতাদের কাছে সুব্রতকে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে সুব্রত থমথমে মুখ। করে দাঁড়িয়ে থাকে আর সুখময়-অরবিন্দরা তার ওপর পুলিশি অত্যাচারের রোমহর্ষক কাহিনি শোনায়। ছাত্রনেতারা গরম হয়ে ওঠে, কিন্তু স্ট্রাইকের প্রশ্নে তক্ষুনি রাজি হয় না।

রাত নটা পর্যন্ত এ-রকম চলল। সুব্রত তখন রীতিমতন একটা দর্শনীয় বস্তু। তাকে ঘিরে রীতিমতন গুলতানি চলছে ধৃতিকান্তদের বাড়িতে। ঠিক হয়েছে, কাল সকালে পরীক্ষার হলের সামনে সুব্রতকে দাঁড় করানো হবে টুলের ওপর। এই ছেড়া জামাটাই কাল পরে আসবে। অন্য ছেলেরা তাকে দেখিয়ে বক্তৃতা দেবে জ্বালাময়ী ভাষায়।

ন-টা বেজে দশ মিনিটে সুব্রত মন পালটাল। ধৃতিকান্তর মামা ডাক্তার। তাঁর প্যাড থেকে চারটে কাগজ চুরি করে সুব্রত চারখানা প্রেসক্রিপশন জাল করল। তারপর বউবাজার-পার্ক স্ট্রিটের ডাক্তারখানাগুলো ঘুরে ঘুরে জোগাড় করল চল্লিশটা ঘুমের বড়ি। রাত ঠিক একটার সময় শিখার কথা চিন্তা করতে করতে সে খেয়ে ফেলল সব কটা।

শেষ চিঠিটা সে শিখাকেই লিখতে চেয়েছিল, বাবাকে কিংবা মাকে নয়। কিন্তু এপর্যন্ত যেমন সে শিখাকে মুখেও কিছু বলতে পারেনি, সেইরকম চিঠিতেও কিছু লেখার কথা খুঁজে পেল না। মৃত্যুর প্রান্তে এসেও। শুধু তো ভালোবাসার কথা নয়। তার চেয়েও বেশিকিছু।

তিন দিন পর সুব্রত হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরল। শরীর এখনও বেশ দুর্বল, তা ছাড়া আর পরীক্ষা দেওয়ার অবশ্য কোনো প্রশ্নই ওঠে না। সুখময়রা সুবিধে করতে পারেনি, প্রত্যেক হলে পুলিশ পাহারা ছিল, পরীক্ষা ঠিকঠাকই চলেছে। সুব্রতর একটা বছর গেল।

বাড়ির আবহাওয়া থমথমে। সেদিনের পর নিশানাথ ছেলের সঙ্গে আর একটাও কথা বলেননি। সকালবেলা খেয়ে-দেয়ে অফিসে বেরিয়ে যান, ফেরেন অনেক রাত্রে। মুখখানা বিমর্ষ। রাত্রে ঘুমের ঘোরে মাঝে মাঝে ওঃ ওঃ শব্দ করে ওঠেন। সেটা ঠিক কষ্টের শব্দ নয়, ক্রোধের। যেন অতিকষ্টে রাগ সামলাচ্ছেন।

সুব্রত ঘুমের ওষুধগুলো খেয়েছিল ঝোঁকের মাথায়। কিন্তু হাসপাতাল থেকে বেঁচে ফিরে আসার পর এখন সে সত্যিই ভাবতে শুরু করেছে, বেঁচে থেকে লাভ কী? সে তার বাড়ির কোনো কাজে লাগে না, পৃথিবীর কোনো কাজে লাগে না। সে একটা অপদার্থ। দুর্বল শরীরে সে ছাদের আলসে ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। মাথাটা ঝিমঝিম করে। রোদের তাপও যেন শরীরটা সহ্য করতে পারে না, আবার একটু জোরে হাওয়া উঠলেই রোমকূপগুলো শিরশির করে।

একদিন রাত্রে বাড়ি ফিরে নিশানাথ বললেন, খোকন কোথায়? খোকনকে ডাকো।

সেই ঘটনার পর দশ দিন কেটে গেছে। মা আর বাসন্তী ভয় পেয়ে গেলেন। আজ বুঝি বাপ-ছেলেতে বোঝাপড়া হবে। কর্তার শরীরে যা রাগ, অত বড়ো শরীর ভরতি অনেকখানি রাগ, কী থেকে কী হয়ে যায়, তার ঠিক নেই।

সুব্রত এসে দরজার কাছে মাথা নীচু করে দাঁড়াল। সে মনে মনে তৈরি হয়েই এসেছে, বাবা যে শাস্তিই দিন, সে সহ্য করবে। মৃত্যুর চেয়ে তো আর বড়ো শাস্তি হয় না।

দরজার কাছে সুব্রতকে প্রায় ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে মা আর বাসন্তী। মণি একটু দূরে।

নিশানাথ বললেন, খোকন, কাল সকালে তুই আমার সঙ্গে যাবি।

সবাই উৎকর্ণ হয়ে রইল আরও কিছু শোনার জন্য। নিশানাথ জামাটা খুলে আলনায় টাঙিয়ে রেখে বললেন, ঠিক সাতটার সময় বেরোব। তৈরি হয়ে থাকবি।

সবাই চুপ। নিশানাথ আর কিছু বললেন না। এই নিস্তব্ধতা দারুণ অস্বস্তিকর। নিশানাথের কণ্ঠস্বরে কোনো রাগের চিহ্নমাত্র নেই। এই সামান্য কথা বলার জন্য তিনি খোকনকে ডেকেছিলেন?

ঘড়িতে টিকটিক করে শব্দ হচ্ছে।

সকাল বেলা খোকনকে তিনি কোথায় নিয়ে যাবেন সে-কথা জিজ্ঞেস করার সাহস কারুর হল না।

খাবার টেবিলে বসেও আর একটি কথাও উচ্চারণ করলেন না নিশানাথ। চোখের সামনে একটা বই খোলা রইল।

৬. ইন্দ্রাণী সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছিল

ইন্দ্রাণী সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছিল, ঠিক দোতলার বাঁকে ভাস্করের সঙ্গে দেখা। তিরিশ না পেরুতেই ভাস্করের চুলে পাক ধরেছে। লম্বা-চওড়া চেহারা, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা, বয়েসের তুলনায় ভাস্করকে একটু বেশি ভারিক্কি দেখায়।

কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

ইন্দ্রাণী তার নাক ও ঠোঁটের মাঝখানের সামান্য ঘাম রুমাল দিয়ে মুছতে মুছতে বলল, অনুরাধাদের বাড়িতে। তুমি কখন এসেছ?

অনেকক্ষণ। চলে যাচ্ছিলাম। তোর তো দেখাই পাওয়া যায় না।

বাজে কথা বোলো না। আমার তো বাড়ি থেকে বেরোনোই হয় না।

ইন্দ্রাণীর সঙ্গে সঙ্গে ভাস্কর আবার ওপরে উঠে এল। বাড়িটা বড়ো বেশি নিস্তব্ধ। এত বড়ো বাড়িতে লোকজন খুব কম। বাবা ডাক্তার। সন্ধ্যে বেলা তিনি পে ক্লিনিকে বসেন। ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে যায়। ছোটোভাই খঙ্গপুরে পড়ে। এক কাকা আছেন, তিনি প্রায় নির্বোধ, তাঁর বিয়ে দেওয়া হয়নি।

ইন্দ্রাণীর মায়ের একসময় চিত্রশিল্পী হিসেবে খানিকটা নাম হয়েছিল। পুরোনো খবরের কাগজের পাতায় তাঁর ছবির অনেক প্রশংসা খুঁজে পাওয়া যাবে। এখন আর ছবি আঁকেন না। যেকোনো শিল্পই যদি শেষ পর্যন্ত জীবিকা না হয়, তাহলে তার বিকাশ বেশিদূর হতে পারে না বোধ হয়। স্বতঃস্ফূর্ত শিল্পের আয়ু কম।

তবু সীমন্তিনীর এখনও শিল্পী মেজাজটা আছে। ফর্সা, পাতলা চেহারা, কোনোদিন কেউ তাঁকে একটাও গয়না পরতে দেখেনি, কোনোদিন তাঁর শাড়ি বা চুল আলুথালু থাকে না। আজ অবধি কারুকে ধমকে কথা বলেননি। কখনো খুব রাগ হলে পিয়ানো বাজাতে বসেন।

চাকর বাকররা তাঁর কাছ থেকে এত পয়সা চুরি করেছে যে, প্রত্যেকেই দেশে জমি কিনেছে।

ইজিচেয়ারে বসে সীমন্তিনী বই পড়ছিলেন, ভাস্কর আর ইন্দ্রাণী সেই ঘরে এসে ঢুকল। তিনি বই থেকে চোখ তুলে জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছে রে অনুরাধা?

ইন্দ্রাণী বলল, অপারেশন করতে হবে না, তবে প্রায় দু-মাস পা প্লাস্টার করে রাখতে হবে।

আহা মেয়েটার কী দুর্ভোগ।

ইন্দ্রাণীর বান্ধবী অনুরাধার বিয়ে হয়েছে মাত্র এক বছর আগে। স্বামীর সঙ্গে স্কুটারে চেপে যাওয়ার সময় অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। অপরূপ বাতাস দিচ্ছিল তখন, রাস্তায় কারুর মুখে কোনো বিরক্তির চিহ্ন ছিল না, সেই সময়েও মৃত্যু হঠাৎ এসে ভয় দেখিয়ে যায়।

তপনের তো কিছু হয়নি!

বিশেষ কিছু না।

ভাস্কর, তুই মোটরসাইকেলটা এবার বিক্রি করে দে। ভয় করে।

ভাস্কর বেশ তৃপ্তির সঙ্গে হাসল। সে তার মোটরসাইকেলের জন্য গর্বিত বোঝা যায়।

অ্যাক্সিডেন্টের কথা ভাবলে তো কোনো গাড়িই চড়া যায় না।

কিন্তু কলকাতার যা রাস্তা–

ইন্দ্রাণী টেবিলের ওপর পড়ে থাকা চিঠিগুলোতে একবার চোখ বোলালো। একটাও তার নয়, সব কটাই বাবার।

ভাস্করকে সে জিজ্ঞেস করল, তুমি চা খাবে?

দু-বার খেয়েছি। এতক্ষণ তো বসে বসে ছোটোমাসির সঙ্গে গল্প করছিলাম।

কেন, আজ তোমার ক্লাব ছিল না?

অফিসে চাকরিতে ঢোকার পর ভাস্করের একটা বিশ্রী অভ্যেস হয়েছে। একটা পাঁচমিশিলি ক্লাবে গিয়ে প্রত্যেকদিন সন্ধ্যে বেলা তাস খেলে। আগে সে স্কোয়াশ কিংবা টেনিস খেলত।

ভাস্কর ইন্দ্রাণীর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে সংক্ষেপে বলল, যাইনি!

তারপর সে সীমন্তিনীর দিকে ফিরে বলল, ছোটোমাসি, ইন্দ্রাণীকে বলব সেই কথাটা?

সীমন্তিনী অল্প হেসে বললেন, বলে দেখ–তু

ই বিলেত যাবি?

আমি? কেন?

যাবি কি না বল না? যেতে ইচ্ছে হয় না?

ইন্দ্রাণী বলল, তুমি যাচ্ছ বুঝি?

ইন্দ্রাণী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, এবার সে ঘরের বাইরে যাবে। ভাস্কর তাকে চোখ দিয়ে আটকে রেখে বলল, না, আমি নয়, আমাকে কে চান্স দেবে? তবে তুই ইচ্ছে করলেই যেতে পারিস!

শুধু ইচ্ছে করলেই!

হ্যাঁ। আমার এক বন্ধুর বন্ধু, বিলেতেই থাকে, এখন এসেছে, খুব সুন্দর চেহারা, ওখানে বাড়ি আছে, তুই যদি তাকে টুক করে বিয়ে করে ফেলিস–তাহলেই আগামী মাসে বিলেত–

ইন্দ্রাণী অবহেলার ভঙ্গি করে বলল, তার মানে সারাজীবন বিলেতে থাকতে হবে? সে আমি মোটেই ভাবতে পারি না।

সীমন্তিনী বললেন, ছেলেটিকে বাড়িতে একদিন ডাকব?

ইন্দ্রাণী বলল, মা, তুমি আমাকে ছেড়ে থাকতে পারবে?

কী জানি! বোধ হয় পারব!

সীমন্তিনী হেসে আবার বললেন, সব মেয়েরই তো বিয়ে হয়। তোরও হবে নিশ্চয়ই? কলকাতাতেই যে থাকতে পারবি, তার কী কোনো মানে আছে? মণীশের খবর কী রে?

আমি জানি না!

ভাস্কর বলল, আমি জানি!

সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রাণী বলল, বুগনদা, তুমি বোসো। আমি আসছি। চা খাবে না তো ঠিক? আমি কিন্তু খাব।

সিঁড়ি থেকে ঝুঁকে রাঁধুনিকে চা বানাতে বলে ইন্দ্রাণী উঠে এল তিনতলায়। নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলের ক্লিপগুলো খুলতে লাগল। আয়নার সামনে দাঁড়ালে একটু দেরি হয়ই। শাড়ি খুলে ব্লাউজের পিঠের দিকে বোতামে যেই হাত দিয়েছে। দরজায় টুকটুক শব্দ হল।

ইন্দ্রাণী আবার শাড়িটা পরে নিয়ে দরজা খুলে বলল, এসো।

ভাস্কর বলল, আমি এবার যাব।

ইন্দ্রাণী তার খাটের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, বোসো।

ভাস্কর বেশ শব্দ করে বসল। চশমাটা খুলে চোখ দুটো রগড়াল ভালো করে। এটা তার মুদ্রাদোষ। তারপর বলল, সিনেমা দেখতে যাবি?

এখন?

কিংবা কাল?

তোমার সেই বন্ধুর বন্ধুটিও বুঝি যাবে?

রেগে গেছিস নাকি?

তুমি বুঝি আজকাল ঘটকালি শুরু করেছ?

না, না, ওটা তো ছোটোমাসিকে খুশি করার জন্য বললাম।

কী করে জানলে মা এতে খুশি হয়?

বাঃ, ওঁর একটা চিন্তা নেই?

সেইজন্য তুমি বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যেকথা বলবে!

মিথ্যে নয় ঠিক, ওইরকম একটি ছেলে সত্যিই আছে, কালই নিয়ে আসতে পারি। আর তুই যদি রাজি থাকিস, তাহলে সত্যিই ব্যাপারটা হতে পারে। ছেলেটি শুধু একটি সুন্দরী মেয়ে চায়।

ইন্দ্রাণী চুলের মধ্যে চিরুনি ডুবিয়ে দিয়ে বলল, একেই ঘটকালি বলে। তোমাকে বোকা বোকা দেখাচ্ছে।

ভাস্কর দুটো হাত দু-দিকে ছড়িয়ে পেছন দিকে হেলান দিল। পরিশ্রান্তের মতো বলল, আমি যা করতে চাই, কীরকম যেন ভুল হয়ে যায়। সত্যিই হয়তো আমার এব্যাপারে মাথা ঘামাবার দরকার নেই!

ইন্দ্রাণী জোরে জোরে চুল আঁচড়াচ্ছে। কোনো উত্তর দিল না।

ভাস্কর হঠাৎ যেন মন বদলাল। তড়াক করে বিছানা থেকে নেমে বলল, আমি চলি!

তখনই চাকর চায়ের কাপ নিয়ে আসায় সে আবার মন বদলে বলল, আচ্ছা, আর একটু চা খেয়েই যাই। আমার জন্যও আর এক কাপ আনো তো!

ইন্দ্রাণী চায়ের কাপ নিয়ে ড্রেসিং টেবিলের টুলের ওপর বসল। চুলগুলো পিঠের ওপর খোলা। কালো রঙের ব্লাউজ। পায়ের পাতার ওপর ছড়িয়ে আছে শায়ার লেস।

ভাস্কর অন্য সময় খুব হাস্য পরিহাস করে। আজ তার মুখখানা দুঃখীর মতন প্রায়ই অন্যমনস্ক।

সে আস্তে আস্তে বলল, তোর বিয়ে হোক, এটাও আমি চাই। আবার যার সঙ্গেই বিয়ে

হবে, তাকে আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারব না।

ইন্দ্রাণী তবু চুপ করে রইল।

সেইজন্যই আমি মণীশকে সহ্য করতে পারিনি কখনো।

মণীশ? মণীশ তো হারিয়ে গেছে।

তোর মন থেকেও হারিয়ে গেছে?

প্রায়!

আচ্ছা ইন্দ্রাণী, সত্যি করে বল তো, আমার কি এ-বাড়িতে আর আসা উচিত নয়?

কেন?

আমি মানুষটা ভালো না খারাপ? খারাপ হলেও কি খুব খারাপ?

ইন্দ্রাণী এবার হাসল। তার দাঁতগুলো আলোর মতন। যদিও সেই হাসির মধ্যে খানিকটা নিষ্ঠুরতা আছে। ভাস্কর আজ যেকোনো কারণেই একটু দুর্বল হয়ে পড়েছে বলেই ইন্দ্রাণী তার কথা হেসে উড়িয়ে দিতে চাইছে।

তুমি আজ বড় ছেলেমানুষের মতন কথা বলছ।

ভাস্কর তখন লুব্ধভাবে তাকাল ইন্দ্রাণীর বুকের দিকে। ব্লাউজের ওপরে ইন্দ্রাণীর সোনার মতন স্তনের আভাস। খাঁজকাটা কোমর। এই নারীকে অন্য কেউ নিয়ে যাবে।

একটুক্ষণের মধ্যেই ভাস্কর নিজেকে সামলে নিল। চোখ দুটি স্বাভাবিক করে অন্য দিকে সরালো। আবার ফেরালো ইন্দ্রাণীর মুখে। সেখানেই চোখ রইল।

ইন্দ্রাণী চা শেষ করে বলল, দীপারা বরোদা থেকে ফিরেছে?

অর্থাৎ সে অন্যদিকে কথা ঘোরাতে চাইছে।

ভাস্কর বলল, অনেকদিন। তারপর ইঙ্গিত করে বলল, শোন। ইন্দ্রাণী জায়গা না ছেড়েই বলল, কী?

শোন-না।

এবার ইন্দ্রাণী ভয় পেয়েছে। দরজার দিকে তাকাল।

ভাস্কর হাতের কাপটা মাটিতে নামিয়ে রেখে নিজেই এগিয়ে গেল ইন্দ্রাণীর দিকে। তার কাঁধে হাত রেখে বলল, ভয় নেই আমি কিছু করব না।

ইন্দ্রাণী শরীরটাকে একেবারে স্থির করে বসে রইল। ভাস্কর হাত রাখল ইন্দ্রাণীর থুতনিতে। ইন্দ্রাণী ভাস্করের হাতটা ধরল, ঠেলে সরিয়ে দিল না, ধরেই রইল।

অনেকদিন আগে, ভাস্কর তখন ক্লাস টেনে পড়ে, সামনেই পরীক্ষা, এই সময় তার বাবা বদলি হয়ে গিয়েছিল কানপুর। সেই সময় পরীক্ষা দেওয়ার জন্য ভাস্কর কলকাতাতেই থেকে গিয়েছিল তিনমাস ইন্দ্রাণীদের বাড়িতে। তার মা সীমন্তিনীর খুড়তুতো বোন।

সেই সময় অবশ্য ইন্দ্রাণীর ঠাকুরদা-ঠাকুমা দু-জনেই বেঁচে। বাড়িতে আরও অনেক লোকজন ছিল। তবু এক কিশোর এক কিশোরীর সঙ্গে নিরালায় বন্ধুত্ব করতে চাইত। এক পৃথিবী ভরতি কথা জমে থাকত দু-জনেরই বুকে। তিনতলার এই ঘরেই কিশোরটি সেই কিশোরীকে প্রথম চুমু খায়। তাদের দুজনেরই জীবনের প্রথম চুম্বন।

ইন্দ্রাণী সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। লজ্জায় তারপর তিনদিন আর ভাস্করের সামনেই আসেনি। ভাস্করও ঠনঠনের কালীবাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিল, এই পাপের জন্য সে তার পরীক্ষার পরেই নিজের হাত কেটে রক্ত দেবে ঠাকুরের সামনে।

পরের সপ্তাহেই ইন্দ্রাণীর ফ্রকপরা বুকে নিজের চোখ দুটো চেপে ধরে ভাস্কর। ইন্দ্রাণী নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারেনি। যেন সে কিছুই বুঝতে পারছে না এইভাবে দাঁড়িয়েছিল। যদিও ঝনঝন করছিল তার সারাশরীর। অল্পপরে ভাস্কর যখন তার ঠোঁটে আঙুল ছুঁইয়েছিল তখন ইন্দ্রাণী শক্ত করে চেপে রেখেছিল তার ঠোঁট। কিন্তু ভাস্কর যখন তারপর ইন্দ্রাণীর বুকেই চুমু খেতে শুরু করে, তখন ইন্দ্রাণী সেই অসম্ভব ভালোলাগা কিছুতেই অগ্রাহ্য করতে পারেনি।

কয়েকদিন পর, ইন্দ্রাণীর এক মামার বিয়ে হয়েছিল এই বাড়িতে। পাটনা থেকে অনেকে এসেছিল। বিয়ের রাত্রে দোতলার লাইব্রেরি ঘরে ঢালাও বিছানা করে দেওয়া হয়েছিল বাচ্চাদের জন্য। কে আর লক্ষ করেছিল যে অন্ধকারের মধ্যে ইন্দ্রাণী আর ভাস্কর পাশাপাশি চলে এসেছিল কি না। দু-জনে দু-জনের হাত ধরেছিল শক্ত করে, তারপর সেই হাত চলে যায় শরীরের গোপন জায়গায়।

ইন্দ্রাণীকে সম্পূর্ণভাবে দেখবার জন্য ভাস্কর যেদিন বাথরুমের মধ্যে লুকিয়ে বসে ছিল, সেইদিন ইন্দ্রাণী প্রথমে চিৎকার করে উঠতে গিয়ে নিজেই মুখ চাপা দিয়েছিল আগে,

তারপর কেঁদে ফেলেছিল। ভাস্করও ক্ষমা চায় তার কাছে। তার পায়ের পাতা চেপে ধরে মাথা নীচু করে বার বার বলেছিল, আমি খারাপ হয়ে গেছি! আমি ভীষণ খারাপ হয়ে গেছি! আমি পরীক্ষা দিতে পারব না! তারপর অনুতাপদগ্ধ দুই কিশোর-কিশোরী প্রতিজ্ঞা করেছিল ঠাকুরের ছবির কাছে, জীবনে তারা কখনো আর এই পাপ করবে না।

কলেজজীবনে ভাস্করই তার বন্ধু মণীশকে নিয়ে আসে এ-বাড়িতে।

মণীশের স্বভাব ভাস্করের ঠিক উলটো। সে ভাস্করের মতন চাপা নয়। ভাস্কর একজন শিল্পী, কলেজজীবনেই সে বেশ ভালো ছবি আঁকা শুরু করেছিল। প্রেরণা পেয়েছিল সীমন্তিনীর কাছে। কিন্তু চাকরি-বাকরির চেষ্টা না করে শিল্পী হিসেবেই পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করত কি না সে-সম্পর্কে মনস্থির করতে পারেনি। তার বাড়ির আপত্তি ছিল। মণীশের মধ্যে কোনো কিছু সৃষ্টি করার প্রবৃত্তি নেই। সে সদা চঞ্চল, একরোখা। ইন্দ্রাণীকে যখন সে ভালোবাসতে শুরু করল, তখন ব্যবহার ছিল নির্লজ্জ। যখন-তখন এবাড়িতে চলে আসত। ইন্দ্রাণীর বাবা মাকেও সে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছিল, সে কোনো বাধাই মানবে না। এমনকী, অনেক সময় ভাস্করকেও সে বলত, তুই একটু বাইরে গিয়ে দাঁড়া তো, ইন্দ্রাণীর সঙ্গে আমার একটা গোপন কথা আছে। গোপন কথা আর কী, হঠাৎ ওকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাওয়া। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ভাস্কর অনুভব করত, এইবার তার বন্ধু মণীশ ইন্দ্রাণীর বুকে মাথা রাখছে। এইবার সে তার কোমরের কাছে জিভ দিয়ে..

ইন্দ্রাণী বলল, না।

ভাস্কর হাঁটু গেড়ে বসে ক্ষুধার্তের মতন ইন্দ্রাণীর ঠোঁট খুঁজছে। ইন্দ্রাণী হাতের তালু দিয়ে মুখটা ঢাকা দিয়ে বলল, না, বুগনদা এ-রকম পাগলামি কোরো না!

একবার, শুধু একবার।

না। তাহলে মরে যাব, ঠিক মরে যাব।

ভাস্কর আর একটু জোর করতেই ইন্দ্রাণী তাকে একটা ছোটো ধাক্কা দিয়ে উঠে দাঁড়াল। রূঢ় গলায় বলল, এ-রকম আর কক্ষনো কোরো না।

ভাস্করের কান্ডজ্ঞান ফিরে এসেছে। বিবর্ণ মুখে সে-ও উঠে দাঁড়াল। আস্তে আস্তে বলল, আজকাল ঘেন্না করিস, তাই না?

ইন্দ্রাণী খুব স্বাভাবিক গলায় বলল, না। আমি তোমাকে ভালোবাসি। তোমাকে কি ভালো বেসে পারা যায়?

৭. নিশানাথ ঘুম থেকে ওঠেন

নিশানাথ ঘুম থেকে ওঠেন ভোর পাঁচটায়। বাড়ি থেকে ময়দান পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে আবার ফিরে আসেন। নিজের প্রাতঃকৃত্য সেরে তারপর তিনি সুব্রতকে ডেকে তুললেন, বললেন, তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নে।

বাসন্তীও উঠে পড়েছে। সে সাহস করে জিজ্ঞেস করল, বাবা, তোমরা আজকেই ফিরবে তো?

নিশানাথ বললেন, না।

জামাকাপড় কিছু গুছিয়ে দিতে হবে? সঙ্গে যদি নিয়ে যেতে হয়–

কিচ্ছু লাগবে না!

দাঁত-টাত মেজে সুব্রত চোরের মতন ভয়ে ভয়ে চা-জলখাবার খাচ্ছে। কোথায় যাবে, কেন যাবে, কিছুই ঠিক বুঝতে পারছে না।

সাতটার মধ্যেই নিশানাথ ছেলেকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। বাস ধরে শিয়ালদা স্টেশন। টিকিট কেটে নিশানাথ যখন সাউথ স্টেশনের দিকে এগোলেন, তখন সুব্রত ভাবল, তাহলে তো খুব বেশি দূর যেতে হবে না। এদিক তো বড়োজোর ডায়মণ্ডহারবার কিংবা ক্যানিং।

ট্রেনে কিন্তু বাবা আর ছেলে পাশাপাশি বসল না। জানলার ধারে বসবার অছিলায় সুব্রত চলে গেল একেবারে অন্য দিকে। সেখান থেকে আড়চোখে মাঝে মাঝে বাবাকে দেখতে লাগল।

নিশানাথের মুখখানা গম্ভীর। অন্য দিনের চেয়েও বেশি গম্ভীর। শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে আছেন বাইরের দিকে।

নিশানাথ প্রায়ই ছুটির দিনে কলকাতার বাইরে কোথাও যান। একা। সুব্রত আবছাভাবে শুনেছিল, বাবা গ্রামের দিকে তাঁর এক বন্ধুর কাছে যান। সেখানে একটা হাসপাতাল না কী যেন আছে।

একটু বাদে একজন দরিদ্র মুসলমান নিশানাথের পাশে বসে কথা বলতে লাগল। মনে হয় লোকটি তাঁকে আগে থেকেই চেনে। হয়তো এই ট্রেনেই নিশানাথ মাঝে মাঝে যান। ট্রেনটা যাচ্ছে ডায়মণ্ডহারবার, সেখানে গিয়ে কী করবে?

কাল রাত্রে বেশ বৃষ্টি হয়েছিল, গাছপালাগুলোর বেশ পরিচ্ছন্ন চেহারা। কলকাতা ছাড়বার একটু পরেই দু-দিকে এত বেশি ফাঁকা মাঠ, দেখলে ঠিক বিশ্বাসই করা যায় না। তাহলে কলকাতায় এত ভিড় কেন?

যতদূর দেখা যায়, আকাশটা কালো হয়ে আছে। সেই গাঢ়মেঘের ছায়া পড়েছে গাছপালায়। সানগ্লাস চোখে দিলে প্রকৃতিকে যেরকম দেখায়। বাতাসে নারকোল গাছগুলোর ডগা অস্থির। এইরকম সময় মাঠ ও গাছপালার দিকে তাকিয়ে থাকলে চোখে একটা ঠাণ্ডা ভাব লাগে।

সুব্রতর পাশেই একটা লোক কালো চশমা পরে বসে আছে। হাতে একটা লাঠি। প্রথমে সুব্রত কিছু বুঝতে পারেনি, অনেকক্ষণ পরে টের পেল লোকটি অন্ধ। হঠাৎ খুব দুঃখ হল সুব্রতর। এর আগে সে কোনো অন্ধ মানুষের জন্য চিন্তা করেনি। কিন্তু আজ এই সকালে, ট্রেনের জানলায় বসে তার মনে হল, কোনো জীবিত মানুষের অন্ধ থাকা উচিত না। যদি বেঁচে থাকতে হয়, তাহলে চোখ দুটো অন্তত থাকা দরকার। সুব্রত যদি বিশেষ কোনো ক্ষমতা বলে, এইমুহূর্তে লোকটির চোখ দুটো সারিয়ে দিতে পারত! যেন সত্যিই সুব্রত লোকটির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। রহস্যময় ভঙ্গিতে বললে, আপনার চশমাটা একবার খুলুন। লোকটি শুনতে পায়নি। সে নিজেই চশমাটা খুলে, চোখের ওপর আলতো করে হাত বুলোত লাগল। একটুখানি পিটপিট করার পর খুলে গেল চোখ, সেই মধ্যবয়স্ক

লোকটা জীবনে প্রথম চোখ খুলেই তাকিয়ে রইল কটমট করে, যেন চোখের সামনে সব কিছু ভস্ম করে দেবে। সুব্রত ভয় পেয়ে যাচ্ছে। লোকটা কী দৃষ্টিশক্তি পাওয়ায় খুশি না?

...দিল্লি থেকে সুব্রতর ডাক এসেছে। রাশিয়ান, আমেরিকান, ইংরেজ, ফরাসি বৈজ্ঞানিকরা তাকে পরীক্ষা করে দেখবে। সুব্রতর এই অসম্ভব ক্ষমতার কথা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে গেছে। সে কোনো ওষুধ ব্যবহার করে না, সে কোনো মন্ত্রও উচ্চারণ করে না, শুধু যেকোনো অন্ধ লোকের চোখে হাত দিয়ে খুব কোমলভাবে বলে, তাকাও, আমার দিকে তাকাও! অমনি অন্ধদের চোখ খুলে যায়। এর ফলে অবশ্য সুব্রতর নিজের দৃষ্টিশক্তি অনেক কমে আসছে। তা হোক, যে ক-দিন বাঁচবে, যদি আরও কয়েক হাজার অন্ধের চোখ খুলে দিতে পারে...

বৈজ্ঞানিকরা বলছেন, আপনার কায়দাটা কী বলুন, মি. হালদার! আমরা যন্ত্রপাতি দিয়ে সেটা পরীক্ষা করে দেখব, তারপর যদি ফর্মুলাটা বার করা যায়, তাহলে চিকিৎসাবিজ্ঞানে একটা যুগান্তর এসে যাবে!

সুব্রত উত্তর দিল, আমার তো কোনো কায়দা নেই! শুধু মনের জোর। আমি খুব আন্তরিকভাবে বলি, পৃথিবীতে কেন কেউ অন্ধ থাকবে? তুমি তাকাও...

ট্রেন এসে থামল বারুইপুরে। একগাদা লোক হুড়মুড় করে উঠে এল কামরায়। সুব্রতর ঘোর ভেঙে গেল। অন্ধ লোকটি জানলায় মাথা রেখে ঘুমোচ্ছে। সুব্রত বাবার দিকে একবার তাকাল। নিশানাথ সেই মুসলমানটির সঙ্গে আলোচনায় মত্ত। কোথায় নামতে হবে তা সুব্রত এখনও জানে না।

বাবার সঙ্গে সুব্রত অনেকদিন কোথাও যায়নি। স্কুলে পড়ার সময় সুব্রতকে বাবার সঙ্গে বাজারে যেতে হত। নিশানাথ তখন প্রতিদিন ভোর বেলা উঠে গঙ্গায় সাঁতার কাটতে যেতেন, সেখান থেকেই চলে আসতেন বাজারে। সুব্রত ঠিক সাড়ে সাতটার সময় নির্দিষ্ট আলুর দোকানের পাশে থলি হাতে দাঁড়িয়ে থাকত। নিশানাথ বাজার করে দিয়ে ছেলের

হাতেই পাঠিয়ে অন্য কোথায় যেন চলে যেতেন। সুব্রত নিজে কখনো বাজার করেনি, বাজারের থলে বহন করেছে।

একবার শুধু বড়োমামার বিয়ের সময় যাওয়া হয়েছিল পাটনায়। তখন সুব্রত খুবই ছোটো, তখন বাবার সঙ্গে কথা বলতে ভয় করত না। বাবাও বোধ হয় তখন এ-রকম গম্ভীর ছিলেন না। রাগি ছিলেন অবশ্য খুবই। দুটো ঘটনা এখনও মনে আছে। জসিডি স্টেশনে বাবা কুজোতে জল ভরে আনতে গিয়েছিলেন। হঠাৎ ট্রেন ছেড়ে দিল। বাবাকে কোথাও দেখা গেল না। মা চেঁচামেচি শুরু করে দিলেন। অন্য লোকেরা বলল, ভয় কী নিশ্চয়ই অন্য কামরায় উঠেছেন। এমন সময় দেখা গেল, বাবা দৌড়ে দৌড়ে আসছেন। এক হাতে কুঁজো, এক হাতে চটি, বাবা লম্বা লম্বা পায়ে দৌড়োচ্ছেন। পাশে পাশে দৌড়াচ্ছে আর একজন কাবুলিওয়ালা। ট্রেন তখন বেশ জোরে যাচ্ছে। সমস্ত কামরা থেকে লোকেরা জানলা দিয়ে ঝুঁকে দেখছে বাবাকে আর চেঁচিয়ে বলছে, যেকোনো কামরায় উঠে পড়ুন! চেন টানার কথাও কারুর মনে পড়েনি। শেষপর্যন্ত বাবা সেই কাবুলিওয়ালাকেও হারিয়ে দিয়ে আগে দৌড়ে এসে ঠিক নিজের কামরাতেই উঠলেন। সুব্রতর খুব গর্ব হয়েছিল।

সুব্রতর তখন এগারো বছর বয়েস। তার জন্য কাটা হয়েছিল হাফ টিকিট। বয়সের তুলনায় সুব্রতকে বেশি লম্বা দেখাতো। একজন খিটখিটে মতন টিকিট চেকার উঠে অনেকক্ষণ ধরে টিকিট পরীক্ষা করে সুব্রতকে দেখিয়ে বলেছিল, এর বয়েস বেশি, এর ফুল টিকিট কাটতে হবে। এইসব কথা শুনলে বাবা যে কীরকম রেগে যান তা আর বাইরের লোক জানবে কী করে? বাবা কী বলে চেঁচিয়ে উঠে দাঁড়াতেই মা ভয় পেয়ে বলেছিলেন, ঝগড়া কোরো না। বাকি টাকাটা দিয়ে দাও। কিন্তু বাবাকে এত সহজে সামলানো যায় না। বাবা চেকারবাবুকে বললেন, আমার ছেলের বয়েস আমি জানি না? আপনি শেখাবেন? চেকারটা নাছোড়বান্দা। ফুল টিকিট না নিয়ে ছাড়বে না। কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটির পর চেকারটি বাবাকে একবার মিথ্যেকথা বলছে বলায় বাবা ঠাস করে এক চড় মেরেছিলেন। চড় খেয়ে টলে পড়ে গিয়ে চেকারটি-র মাথা ঠুকে গেল। সে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইল। বাবা তখনও হাত তুলে বলেছিলেন, আর একটা কথা বললে, আর এক চড় মারব।

ব্যাপার অনেকদূর গড়িয়েছিল। পরের স্টেশনে চেকারবাবুটি পুলিশ ডেকে এনেছিলেন। মা কাঁদছিলেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। বাবা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে স্টেশনমাস্টারকে বলেছিলেন, হ্যাঁ, মেরেছিই তো, বেশ করেছি। আমাকে মিথ্যেবাদী বললে মারব না? মায়ের কান্নাকাটির জন্যই শেষপর্যন্ত অন্যযাত্রীরা মধ্যস্থ হয়ে মিটিয়ে দেয়। বাবা তখনও গোঁ ধরেছিলেন, চেকারকে ক্ষমা চাইতে হবে। সেবারও সুব্রতর খুব গর্ব হয়েছিল বাবার জন্য। তার বাবা ছাড়া আর কী কেউ একজনকে চড় মারার পরেও ক্ষমা চাইতে বলতে পারে?

সুব্রত তার বাবাকে মার খেতেও দেখেছে একবার। চৌষট্টি সালের দাঙ্গার সময়। সকাল বেলা বাজারের মধ্যে হঠাৎ মারামারি শুরু হয়ে গেল। একটা বুড়ো ডিমওয়ালাকে বাঁশ দিয়ে পেটাচ্ছিল কয়েকজন লোক। বাবা বাজারের থলিটা সুব্রতর হাতে দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন লোকগুলোর ওপর। লাথি, কিল, ঘুসি মেরে তাদের সরিয়ে দিয়ে বুড়ো লোকটাকে আড়াল করে দাঁড়ালেন। বুড়োটির তখন উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। অন্য লোকগুলো কিন্তু ছাড়েনি। বাবাকেও মারতে শুরু করেছিল। বাবা তাঁর বিশাল শরীর নিয়ে বুড়ো লোকটার ওপর ঝুঁকে রইলেন, আর তাঁর পিঠে পড়তে লাগল দমাদ্দম বাঁশ আর লোকের লাথি। সুব্রতর দম আটকে এসেছিল। কথা বলার ক্ষমতা ছিল না। ভিজিলেন্স পার্টির ললাকেরা না এসে পড়লে নিশানাথ বোধ হয় সেইদিনই মরে যেতেন। কিংবা শেষমুহূর্তে ঘুরে দাঁড়ালে বোধ হয় আরও দু-একজন লোকের প্রাণ যেত।

ডায়মণ্ডহারবার এসে গেছে। নিশানাথ উঠে দাঁড়িয়ে ছেলের দিকে তাকালেন। সুব্রত ট্রেন থেকে বেরিয়ে নেমে এল। নিশানাথ এখনও কোনো কথা বলছেন না। স্টেশন থেকে বেরিয়ে হাঁটতে লাগলেন। টিপিটিপি বৃষ্টি পড়ছে। এখানে সাইকেল-রিকশা আছে, কিন্তু বাবা যে রিকশাতে উঠবেন না, তা তো সুব্রত আগে থেকেই জানে। চার-পাচ মাইল হাঁটতে হলেও রিকশা নেওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। নিশানাথ জীবনে একবারও রিকশা চেপেছেন কিনা সন্দেহ।

বেশিদূর হাঁটতে হল না অবশ্য। কাছেই বাস স্ট্যাণ্ড। নিশানাথ সুব্রতকে নিয়ে কাকদ্বীপের বাসে চাপলেন। সুব্রতর কৌতূহল ক্রমশই প্রখর হচ্ছে। এর আগে বন্ধুদের সঙ্গে দু-একবার ডায়মণ্ডহারবার দেখতে এলেও কাকদ্বীপে কখনো যায়নি। তার আগ্রহই হচ্ছে এখন।

কিন্তু কাকদ্বীপ যাওয়া হল না। মাত্র আধ ঘণ্টা বাদেই নিশানাথ আবার বাস থেকে নেমে পড়লেন মাঠের মধ্যে। জনমানবশূন্য জায়গা। দু-পাশে চাষের খেত, মাঝখান দিয়ে একটা সরু পায়ে-চলা রাস্তা। নিশানাথ সেই রাস্তা ধরলেন।

সুব্রত আর কৌতূহল চেপে রাখতে পারল না। সে হঠাৎ বলে ফেলল, আমরা কোথায় যাচ্ছি?

নিশানাথ ছেলের দিকে না তাকিয়েই উত্তর দিলেন, গঙ্গার ওপারে।

সেখানে কী আছে?

গেলে দেখতে পাওয়া যাবে।

ব্যাস, এরপর আর কথা চলে না। সুব্রত চুপচাপ হাঁটতে লাগল। জল-কাদায় পিচ্ছিল পথ, একটু অসাবধান হলেই চিত্তির হতে হবে। চটি একেবারে কাদায় মাখামাখি। এ-রকম রাস্তায় আসতে হবে জানলে সুব্রত রবারের জুতো পরে আসত। বাবা তো আগে থেকে কিছুই বলবেন না।

আকাশ এখন প্রায় মিশমিশে কালো। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝিলিক দিচ্ছে। যেকোনো সময় দারুণ বৃষ্টি নামবে। বৃষ্টি নামলে দাঁড়াবার কোনো জায়গা নেই। মাঝে মাঝে দু-একটা রোগা রোগা গাছ ছাড়া একবারে ধু-ধু করছে মাঠ।

সুব্রতর মনে হচ্ছে যেন সে একেবারে অন্তহীন পথ হেঁটে চলেছে। আর কতদূর যেতে হবে কে জানে? নিশানাথ এত জোরে জোরে হাঁটেন যে, তাঁর সঙ্গে পাল্লা রাখতে গেলে সুব্রতকে প্রায় দৌড়াতে হয়।

একসময় সামনেই দেখা গেল নদী। রাস্তাটা যেন সোজা এসে নদীতে ডুব দিয়েছে। হু-হু করছে হাওয়া। সুব্রতর লম্বা চুল উড়ে এসে পড়ছে চোখে-মুখে। জামাটা এমন পতপত করে উড়ছে, যেন পকেটগুলো উলটে গিয়ে পয়সাকড়ি পড়ে যাবে।

গঙ্গা এখানে প্রায় সমুদ্রের মতো চওড়া। গাঢ় মেঘের ছায়ায় জলের রং এখন রহস্যময়। ছলাৎ ছলাৎ করে ঢেউ এসে ভেঙে পড়ছে পাড়ে। ওপারটা দেখাই যায় না। ভীষণ শব্দে মধ্য আকাশে একটা বজ্রপাত হতেই সুব্রত দারুণ চমকে উঠল। তার বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করছে। এত বড়ো নদী দেখে তার চিত্ত উদবেলিত হয়নি। সে ভয় পেয়েছে। তার জলের ভয় আছে।

তিনটে ছোটো নৌকো বাঁধা আছে ঘাটের কাছে। একটাতেও লোক নেই। নিশানাথ উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখে এলেন। তাঁর ভুরু কুঁচকে গেছে।

কাছেই একটা অশ্বত্থ গাছের নীচে দু-টি খড়ের চালা। একটি বোধ হয় চায়ের দোকান। অন্যটিতে মাছের পাইকাররা বসে। নিশানাথ সেই দিকে হাতছানি দিয়ে ডাকতে লাগলেন, মাঝি কে আছে? কার নৌকো ভাড়া যাবে?

প্রবল হাওয়ার জন্য ভালো করে কথা শোনা যায় না। তবু নিশানাথের হাঁকডাকে টোকা মাথায় দু-জন লোক নেমে এল। নিশানাথ বললেন, ওপারে রামশিঙাতে যাব। কোন নৌকা যাবে?

একজন বলল, এখন কোনো নৌকা যাবে না বাবু!

কেন?

দেখছেন-না ঝড়-বৃষ্টি আসছে!

নিশানাথ যেন কথাটা শুনে অবাক হলেন। যেন তিনি আকাশের দিকে একবারও তাকাননি। এবার তাকালেন। তারপর তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন, কোথায় ঝড়-বৃষ্টি? অনেক দেরি আছে।

মাঝি বলল, না বাবু, গতিক খুব খারাপ। আপনি একটু বসে যান। একধারা বৃষ্টি হয়ে যাক আগে।

নিশানাথ বললেন, বৃষ্টি আসবার আগেই আমরা পৌঁছে যাব। কতক্ষণ আর লাগবে?

আধঘণ্টা বড়োজোর।

না বাবু, উজানে যেতে হবে, সোওয়া ঘণ্টা লাগবে অন্তত।

তাগদ দিয়ে টানতে পারলে পৌনে এক ঘণ্টার বেশি কিছুতেই লাগে না। তোমরা যাবে কী না বলো।

মাঝি দু-টি নিজেদের মধ্যে সামান্য পরামর্শ করে বলল, না।

নিশানাথ একটুক্ষণ গুম হয়ে রইলেন। তাঁর কোনো ইচ্ছেতেই বাধা পড়লে তিনি সহ্য করতে পারেন না। মাঝিরা যেতে একেবারেই রাজি না হলে, তিনি বোধ হয় সাঁতরেই গঙ্গা পার হওয়ার চেষ্টা করবেন।

নিশানাথ গম্ভীরগলায় জিজ্ঞেস করলেন, নাসিরুদ্দিন নেই এখানে? সে আমাকে ঠিক নিয়ে যেত। সে ভয় পায় না।

একজন মাঝি অবহেলার সঙ্গে বলল, নাসিরুদ্দিন তো ওই ঘরে বসে চা খাচ্ছে।

একটু ডাকো তো।

মাঝি দুজন জায়গা ছেড়ে নড়ল না।

নিশানাথ নিজেই দুপদুপ করে পা ফেলে চলে গেলেন চায়ের দোকানের কাছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একজন লুঙি-পরা বৃদ্ধকে নিয়ে ফিরে এলেন। লোকটি এমনই রোগা ও নিরীহ ধরনের যে তাকে দেখলে খুব একটা সাহসী পুরুষ মনে হয় না।

তুমি পারবে না নাসিরুদ্দিন?

নাসিরুদ্দিন খুব শান্তভাবে বলল, শোনেন বড়োবাবু, আমার দুইডে কথা শোনেন। আর ঘণ্টাভরের মধ্যে ভাড়ি পইড়বে। তখন ড্যাংডেঙিয়ে চলে যাব। আর বাদলাটাও যদি ইয়ের মধ্যে কেঁপে যায়–

নিশানাথ শিশুর মতন ছটফটে। তাঁর সব কিছুই এক্ষুনি চাই। তিনি মাঝিকে মাঝপথেই বাধা দিয়ে বললেন, তুমি কি আগে আমাকে উজান বেয়ে পার করে দাওনি?

তা দিছি। তবু শোনেন–

আগে আমার কথা শোনো! বৃষ্টি আসতে এখনও দেরি আছে।

কিন্তু তুফানডা দেখেন।

সামান্য হাওয়া দিচ্ছে, এর নাম তুফান? তুমি ভয় পাচ্ছ!

আমার শরীরডে ভালো নেই। বেমারিতে ধরেছে এবার।

কী হয়েছে?

পেডের মধ্যে দরদ হয়।

দুর, পেটব্যথা আবার কোনো অসুখ নাকি! চলল, চলো, আর দেরি কোরো না।

বইঠে ধরবে কে! শুকুর ছোঁড়াডা তো এখেনে নেই।

আমি বইঠা ধরব। ধরিনি আগে? চিন্তা কোরো না, চলো–

গ্রাম্য মাঝিটি অবিকল ফরাসি কায়দায় কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, আপনি তো কোনো কথাই শোনেন না।

সে এগিয়ে গিয়ে দড়ির বাঁধন খুলতে লাগল। নিশানাথ এবার হৃষ্টস্বরে বললেন, চলো, তোমাকে খিচুড়ি খাওয়াব।

খানিকটা জলের মধ্যে দিয়ে গিয়ে নৌকোয় উঠতে হবে। নিশানাথ সেই দিকে এগোতে এগোতে সুব্রতকে বললেন, জুতো খুলে হাতে নিয়ে নে।

সুব্রত থমকে দাঁড়িয়েই রইল। তার গলা শুকিয়ে গেছে। মরিয়া হয়ে বলল, বাবা, আমি সাঁতার জানি না।

তাতে কী হয়েছে?

সুব্রতর ইচ্ছে হল দৌড়ে পালিয়ে যায়। বাবার এই গোঁয়ারতুমির কী মানে হয়? মাঝিরাও পর্যন্ত ভয় পাচ্ছে, নদীর বুকে আর একটাও নৌকো দেখা যাচ্ছে না, অন্ধকারে ঢেকে গেছে দিগন্ত, তবু এরমধ্যেই যাওয়া চাই! মাঝিদের উচিত বাবাকে জোর করে আটকানো। সুব্রত পারবে না, কিছুতেই পারবে না, এই ভয়ংকরী নদী পার হতে।

কিন্তু নিশানাথ নৌকোর ওপর উঠে ছেলের দিকে হাত বাড়িয়ে যেই বললেন, আয়, সুব্রত আর প্রতিবাদ করতে পারল না। জুতো খুলে জলে নেমে পড়ল। আশ্চর্য, জলটা গরম।

নাসিরুদ্দিন কাদার মধ্যে বইঠার এক খোঁচা দিতেই নৌকো জলে ভেসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে দুলতে লাগল খুব।

ছই লাগানো ছোটো নৌকা। সুব্রত টলটলে পায়ে গলুই থেকে এগিয়ে গিয়ে ঠিক মাঝখানের পাটাতনের ওপর বসে শক্ত করে ধরে রইল। নাসিরুদ্দিন বইঠাটা নিশানাথের হাতে তুলে দিয়ে নিজে ডগার কাছে গিয়ে হাল ধরল। নিশানাথ জলে ছপছপ করে বইঠা ফেলতে লাগলেন। তাঁর বেশ অভ্যেস আছে মনে হয়।

সুব্রতর মুখ-চোখ সাদা হয়ে গেছে। জীবনে তো কখনো এত ভয় পায়নি। নৌকোটা অসম্ভব দুলছে। একবার যদি উলটোয়, তাহলে সে পাথরের টুকরোর মতন টুপ করে ডুবে যাবে। কিন্তু সাঁতার জানলেও এত বড়ো নদীতে কী নৌকো উলটোলে বাঁচা যায়? পাড় থেকে যত দূরে সরে আসছে, তত হাওয়ার জোর বাড়ছে। নিজের মাথার লম্বা লম্বা চুলই চাবুকের মতন ঝাপটা মারছে চোখের ওপর। পাটাতন থেকে হাত তুলে যে চুল সামলাবে সে সাহস নেই। এক-একবার বিদ্যুৎ চমকের পরেই হাড় আরও হিম হয়ে আসছে, তার কয়েক মুহূর্ত পরেই বজ্রের গুরুগুরু আওয়াজ। নদীটা যেন বিরাট একটা হিংস্র প্রাণী, অপেক্ষা করে আছে। সুব্রত জলের দিকে তাকাতেও সাহস করছে না।

নিশানাথের ভঙ্গি কিন্তু নিশ্চিন্ত। অল্প অল্প বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। বড়ো বড়ো ফোঁটা। হাওয়ার তেজের জন্যই বৃষ্টিটা ঝুপঝাপ করে নামতে পারছে না। ভিজে জামার মধ্যে দিয়ে লোহার দরজার মতো নিশানাথের শক্ত বুকটা দেখা যায়। বইঠা টানার সময় ফুটে উঠছে তাঁর হাতের সবল পেশি। তাঁকে কোনো জলদস্যুর ভূমিকায় চমৎকার মানায়। এখন তাঁকে দেখলে কে বিশ্বাস করবে যে, এই মানুষই কোনো সওদাগরি অফিসে দশটা-পাঁচটার চাকুরি করে!

সুব্রত অদ্ভুত ভাঙা গলায় জিজ্ঞেস করল, বাবা, আর কতক্ষণ লাগবে?

নিশানাথ বললেন, এখনও তো অর্ধেকও আসিনি। তারপর গলা চড়িয়ে ডাকলেন, নাসিরুদ্দিন, ও নাসিরুদ্দিন, এ-রকম একটা নৌকোর কত দাম পড়ে?

নাসিরুদ্দিন উত্তর দিল, কিনতে চান নাকি?

কিনে রাখলে মন্দ হয় না। তাহলে আর তোমাদের সাধতে হয় না। কীরকম দাম?

বিককিরি আছে একডা লৌকা, সাড়ে পাঁচ-শো চেয়েছে।

সাড়ে পাঁচ-শো? বড্ড বেশি দাম। ক-পয়সার কাঠ আছে এতে? সাড়ে তিন-শো-চার-শোর মধ্যে পাওয়া যায়।

ছাউনিতে তেরপল পাবেন।

ছাউনি-ফাউনি আমার দরকার নেই। ডিঙি হলেও চলবে।

ভরা বর্ষায় ডিঙি কী করবেন?

নিশানাথ একবার চতুর্দিকে চোখ ঘোরালেন। তারপর বললেন, এ আর কী নদী দেখছ! পদ্মায় গেছ কখনো? আমার ছেলেবেলায় সেখানে আমি নৌকো চালিয়েছি।

বৃদ্ধ মাঝি একটুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, আর বাবু, কুথাও আর যাওয়া হবে। পেট বড়ো ব্যথা ব্যথা করে—

ওষুধপত্র খাওনি কিছু?

ইন্তেকালে আর ওষুধড়া কোন কাজে লাগে?

নিশানাথ ভর্ৎসনার চোখে তাকিয়ে রইলেন মাঝির দিকে। মৃত্যুর কাছে এ-রকম আত্মসমর্পণ করে দেয় কেন মানুষ? মৃত্যু তো একটা ঘটনামাত্র। তার আগে নিজের কাজ সম্পূর্ণ করার মতন মনের জোর হারালে চলবে কেন?

একটা পোর্ট কমিশনের ছোটো জাহাজ বৃষ্টির মধ্যে রহস্যময় বাড়ির মতন ধীরগতিতে এগোচ্ছে, তারই কী বড়ো বড়ো ঢেউ। ঢেউ-এর ধাক্কায় নৌকোটা লাফিয়ে উঠল। তারপর আবার নীচে নেমেই দু-দিকে এমন কাত হতে লাগল যেন এক্ষুনি হুড়হুড় করে জল উঠে

আসবে। বৃদ্ধ নাসিরুদ্দিন কাত হয়ে শুয়ে পড়ে হালটা চেপে ধরে আছে। বৃষ্টিতে চুপসে গেছে। তার সাদা দাড়ি।

এই টালমাটালের সময় সুব্রত একটা ভুল করল। নৌকো এক দিকে কাত হতেই সে ভয় পেয়ে সরে এল অন্য দিকে। ফলে পরের মুহূর্তেই সেই দিকটা আরও বেশি কাত হয়ে গেল, জল ঢুকে এল খানিকটা।

নিশানাথ ধমক দিয়ে বললেন, কী বোকার মতন করছিস? ওইখানে একটা মগ আছে, জলটা ছেঁচে ফেল–

সুব্রত সে-কথা শুনতে পেল না। আর একটা চোখ-ধাঁধানো বিদ্যুৎ ও কান-ফাটানো বজ্রপাতের সঙ্গে সঙ্গে সে যেন একেবারে অন্ধ হয়ে গেল। পাটাতনগুলো ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে এসে নিশানাথের হাঁটু চেপে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলল, বাবা, আমার ভয় করছে। ভীষণ ভয় করছে।

নিশানাথ আবার বললেন, কী পাগলের মতন করছিস! যা, ওইখানে গিয়ে বোস! জলটা ঘেঁচে ফেল!

সুব্রত তখন সত্যিই পাগল। মৃত্যুভয় তাকে উন্মত্ত করে তুলেছে। ইতিমধ্যেই যেন সে জলে ডুবে গেছে এবং তার দম আটকে এসেছে, এইরকমভাবে সে বলতে লাগল, নাঃ, নাঃ, নাঃ, আমি পারব না–

নিশানাথ জল থেকে বইঠা তুলে হিংস্রভাবে তাকালেন ছেলের দিকে। মনে হল যে তিনি রাগের চোটে বইঠার ঘা মারবেন ছেলের মাথায়। তার বদলে, বইঠা ছেড়ে তিনি দু-হাতে ছেলেকে উঁচু করে তুলে ছুড়ে ফেলে দিলেন মাঝগঙ্গায়। চেঁচিয়ে বললেন, দেখ, এবার দেখ!

৮. আগের রাত্রির অর্ধেক শেষ করা ইংরেজি উপন্যাস

আগের রাত্রির অর্ধেক শেষ করা ইংরেজি উপন্যাসটা বালিশের পাশেই ছিল। ঘুম ভাঙার পরই অনিন্দ্য আবার বইটা তুলে নিল বুকের ওপর। ঘুমের ঘোরে বইটার ওপর অনেকবার তার মাথা এসে পড়েছিল, তাই কয়েকটা পাতা দুমড়ে গেছে, শক্ত বাঁধাই বলে ঘেঁড়েনি।

মস্তবড়ো খাটে অনিন্দ্যর একটা বিছানা। চারটে মাথার বালিশ, তিনটে পাশবালিশ, একটা ছোটো কান-বালিশ। শরীরের বিভিন্ন জায়গায় বালিশ রেখে ঘুমোননা তার অভ্যেস। জেগে উঠেও সে বই পড়ার সময় অন্যমনস্কভাবে বালিশগুলো নিয়ে চটকা-চটকি করে।

বিছানায় শুয়ে শুয়েই সে তিন কাপ চা খেল এবং চারটে সিগারেট। ঝি-চাকররা চা দিয়ে যায়, বাড়ির কোনো লোক সকাল বেলা তার ঘরে আসে না। তার মা স্নান করে ঠাকুরঘরে ঢুকেছেন, দশটার আগে বেরোবেনই না।

অনিন্দ্যর ঘরের সামনের বারান্দায় ঝোলানো খাঁচায় একটা ময়না অনেকক্ষণ ধরে কর্কশভাবে চেঁচাচ্ছে। সে বোধ হয় সকালের বরাদ্দ ছোলাটা এখনও পায়নি। অদূরে রেলিং এর ওপরে বসে ডাকাডাকি করছে কয়েকটা স্বাধীন শালিক। একতলায় কেউ কারুকে

ডাকছে, ও রতনের মা, রতনের মা! অনিন্দ্যর দাদার অফিসঘরে টাইপরাইটারের শব্দ হচ্ছে খটাখট খটাখট। গ্যারেজে ড্রাইভার গাড়ির ইঞ্জিন গরম করছে, তার শব্দ আসছে গ্যার গ্যার গ্যাররর-।

অনিন্দ্য ধ্যানীর মতন একমনে উপন্যাসটা পড়ে যাচ্ছে। তার লম্বা শরীরটা বিছানায় শুয়ে থাকলেও মনটা তখন স্পেনের পাহাড়ি এলাকায়। প্রায় ন-টায় সময় সে-বইটা হাতে

নিয়েই চলে গেল বাথরুমে। সেখান থেকে প্রায় চল্লিশ মিনিট বাদে যখন বেরোলো, তখন বইটা শেষ হয়ে গেছে। মুখটা গম্ভীর, চোখে একটা বিষণ্ণ ভাব। কোনো ভালো বই শেষ করলে এ-রকম হয়।

একজন চাকর এসে জিজ্ঞেস করল, দাদাবাবু খাবার দেব?

দাও।

একটু পরে খাবার এল। দু-টি ডিমের পোচ দু-স্লাইস টোস্ট, একটি কলা, এক গেলাস দুধ। অনিন্দ্য অন্যমনস্কভাবে খাবারগুলো শেষ করল। এবং ওই বইটা পড়ার সুফল তার মধ্যে কাজ করে গেল অনেকক্ষণ।

তন্ময় হয়ে বলতে লাগল, স্পেনের বিপ্লবীদের মতন সেও কোনো বিপ্লবী দলে যোগ দিতে পারত না? জঙ্গলে, পাহাড়ের গুহার মধ্যেই দিনের পর দিন..খাদ্য নেই, কাঁধে ঝোলানো রাইফেল—লড়াই কাকে বলে সে দেখিয়ে দিত! অনিন্দ্যদের বাড়িতে সবরকম আরামের ব্যবস্থা আছে, অথচ সে কষ্ট সহ্য করতে চায়।

পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে, এখন দু-টি কাজ সে করতে পারে। কলেজের ইউনিয়নের ইলেকশনে খানিকটা মদত দেবে, সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। পরীক্ষা যখন ঠিকঠাক হয়ে গেল, তখন এ ব্যাপারে তার একটা নৈতিক দায়িত্ব আছে। এদিকে আবার মুম্বই থেকে ছোটোমামা নেমন্তন্ন করেছেন। গোয়া বেড়াবার প্রলোভন আছে সেইসঙ্গে। অনিন্দ্যর অবশ্য নিজের বেশি ইচ্ছে অন্য একটা ব্যাপারে। দিল্লি থেকে তেহরান পর্যন্ত একটা মোটরগাড়ির রেস হচ্ছে— ছোটোকাকার বন্ধু সোমেন যোগ দিচ্ছে তাতে। সোমেনদার গাড়িতে চড়ে যদি তেহরান যাওয়া যেত—দারুণ এক্সাইটিং। দাদাকে রাজি করানো গিয়েছিল, টাকাপয়সার ব্যাপারেও অসুবিধে হত না, স্টিলের ব্যাবসা করে দাদার হাতে এখন অনেক টাকা। কিন্তু মা একেবারে বেঁকে বসেছেন। গাড়ির রেসে নাকি প্রাণের ভয় আছে।

মায়ের ওপর রাগ হয় অনিন্দ্যর। মায়েরা একটা জিনিস বোঝে না, প্রত্যেকেই নিজের প্রাণটা ভালোবাসে। ছেলের প্রাণের ওপর ছেলের চেয়েও মায়ের ভালোবাসা বেশি, এ কখনো হতে পারে?

অনিন্দ্যর বাবা মারা গেছেন অনেক আগে। ব্যাবসার ব্যাপারে সে-সময় কী একটা দারুণ গন্ডগোল হয়েছিল। খুব সম্ভবত তাঁকে পুলিশে ধরত, তার আগেই স্ট্রোক হয়। বাবা স্বর্গে চলে গেছেন বেশ সসম্মানে। এই বিষয়টা অনিন্দ্যর কাছে অনেকদিন গোপন করে রাখা হয়েছিল, কিন্তু সে জেনে গেছে ঠিকই। দাদা এখন ব্যাবসাটা আবার খুব ভালোভাবে সামলে নিয়েছে। এবাড়িতে দুঃখের কোনো ছায়া নেই।

জানলা দিয়ে অনিন্দ্য তাকিয়ে থাকে বাইরের দিকে। খবরের কাগজ পড়া হয়নি, কিন্ত অনিন্দ্য সেজন্য বিশেষ আগ্রহ বোধ করছে না।

জল-মেশাননা ফিনফিনে হাওয়া দিচ্ছে। এইসব দিন বেড়াবার দিন। দাদার গাড়িটা ম্যানেজ করে বেরিয়ে পড়তে পারলে বেশ হত। এক-এক সময় দাদার গাড়িতে চড়তে ঘেন্না করে। দাদা একবার একটা লোককে ধাক্কা মেরেছিল। জনতার দাবিতে সেই লোকটাকে সেই গাড়িতেই তুলে নিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, হাসপাতালে পৌঁছোবার আগেই লোকটা মারা যায়। আশ্চর্য, একটা আহত মানুষ আর একটা মৃত মানুষের মধ্যে মাত্র কয়েক মিনিটের তফাত, তবু সব কিছু কীরকম বদলে যায়। একজন আহত মানুষ গাড়িতে চাপলে ঘেন্না করে না, কিন্তু যখনই মনে হয়, পেছনের সিটে একটা মৃতদেহ শুয়েছিল, অমনি গাটা গুলিয়ে ওঠে। লোকটার কশ থেকে গড়ানো কালো কালো রক্ত লেগেছিল সিটে।

সিগারেট ধরিয়ে অনিন্দ্য রাস্তার দিকের বারান্দায় এসে দাঁড়াল এটা তার মেয়ে দেখার সময়। গলির মোড়েই একটা মেয়েদের কলেজ। অনিন্দ্য যে শুধু মেয়েদের দেখে তাই নয়, অনেক মেয়েও চোরাচোখে বারবার তাকায় তার দিকে। অনিন্দ্যর ফর্সা চেহারা,

সুন্দর স্বাস্থ্য এবং ইচ্ছে করেই সে হাতকাটা গেঞ্জি পরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে সেক্স অ্যাপিল দেয়।

ঝাঁক ঝাঁক প্রজাপতির মতন মেয়েরা আসছে। প্রত্যেকের শাড়ির রং আলাদা। আজ পর্যন্ত কখনো হুবহু একরকমের শাড়ি পরা দু-টি মেয়েকে একসঙ্গে দেখা যায়নি। মেয়ে-কলেজের মেয়েরা কিন্তু গেটের সামনে দাঁড়িয়ে জটলা করে না। ক্লাস কেটে চায়ের দোকানে আড্ডা মারতেও শেখেনি এখনও। বড়জোর ক্লাস পালিয়ে সিনেমায় যায়। ওঃ, কী সিনেমাখোর হয় এই মেয়েগুলো! অনিন্দ্য হালকাভাবে শিস দিয়ে একটা গান গাইতে লাগল।

অনিন্দ্যদের উলটো দিকের বাড়িটা সদ্য বিক্রি হয়ে গেছে। ওটা তালুকদারদের বাড়ি ছিল। একসময় কচি তালুকদারকে অনেকেই চিনত। মুম্বই থেকে আর্টিস্টদের এনে ফাংশান করাত। ওর নামই হয়ে গিয়েছিল ফাংশান-দাদা। ওদের বাড়ির এক বউ আত্মহত্যা করায় পরিবারটা একেবারে লন্ডভন্ড হয়ে গেল। কচি তালুকদারের কথা ভেবে অনিন্দ্য ঠোঁটটা একটু বেঁকালো। লোকটা হেরে গেছে। ফাঁপা মানুষ ছিল, একদিন-না-একদিন হারতই।

বাড়িটা এখন কিনেছে কী এক গন্ডেরিয়া না, ঢনঢনিয়া। বড়ো বড়ো বাড়িগুলো ওরাই কেনে। পুরোবাড়িটা প্রায় ভেঙে আগাগোড়া নতুন করে বানাচ্ছে। অনেক কুলি-মজুর খাটছে। বাঁশের ভারায় ইট মাথায় নিয়ে উঠছে কয়েকটা কুলি মেয়ে, মনে হয়, যেকোনো সময় পা পিছলে পড়ে যেতে পারে। অনিন্দ্য অলসভাবে তাকিয়ে আছে সেইদিকে। বিশেষ একটি মেয়ের দিকে তার দৃষ্টি যাচ্ছে বার বার। মেয়েটির শাড়ি শতচ্ছিন্ন, বুকের অনেকটা অংশ দেখা যায়, মুখটা অনেকটা সোফিয়া লোরেনের মতো, মাথায় একসঙ্গে প্রায় দশ-বারোটা ইট নিয়ে উঠছে, পা টিপে টিপে তাল সামলে। মেয়েটি পড়ে না গেলেও তার মাথা থেকে ইটগুলো যেকোনো বার খসে পড়তে পারে—সত্যিই পড়ে কি না সেটা দেখাই যেন অনিন্দ্যর দায়িত্ব।

মেয়েটির পিঠে একটা পোঁটলার মতন বাঁধা। একসময় অনিন্দ্য দেখল, সেটা নড়ছে। তার বুকটা ধক করে উঠল। মেয়েটির পিঠে বাঁধা একটি শিশু। একখানা ইটও যদি খসে ওই শিশুটির মাথায় পড়ে...। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ঈশ্বর আছেন, এই শিশুটির মধ্যেও? ওই কুলি-জননীর পিঠের বোঁচকার মধ্যে বাঁধা অবস্থায় শুয়ে আছেন ঈশ্বর। অনিন্দ্যর শরীরে একটা রোমাঞ্চ হল। মেয়েটি ভারার মাঝপথে দাঁড়িয়ে একটু দম নিচ্ছে, মাথায় অগোছালো ইট, অনিন্দ্য আর সে-দিকে তাকাতে পারছে না ভয়ে।

সকাল বেলা একটা ভালো বই পড়ার জন্যই অনিন্দ্যর তরুণ চিত্ত উদবেলিত হয়ে উঠল। সে একটা জামা গায়ে গলিয়ে বেরিয়ে এল রাস্তায়। অন্য সময় এ-রকম অনেক কিছু দেখেও মনে হয় কী আর হবে! এদেশের অবস্থাই তো এই! এখানে কী মানুষের প্রাণের কোনো দাম আছে? কিন্তু এখন অনিন্দ্যর মনের অবস্থা সেরকম নয়। সে কিছু একটা করতে চায়।

একজন ঠিকাদার কাজ করাচ্ছিল মজুরদের। অনিন্দ্য তার সামনে এসে কর্কশ গলায় বলল, আপনি মানুষ না জানোয়ার?

সে বেচারা হকচকিয়ে গেল একেবারে। কিছু বুঝতে না পেরে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। অনিন্দ্য তার বুকে তর্জনীর খোঁচা মেরে আবার বলল, হ্যাঁ আপনাকেই বলছি। আপনি মানুষ না জানোয়ার।

লোকটা বিমূঢ়ভাবে বলল, কী হয়েছে?

কী হয়েছে? ইচ্ছে করলে এপাড়ায় এবাড়ি আমরা ধুলো করে দিতে পারি। দেখবেন?

আরে ভাই, কী হলটা কী?

লজ্জা করে না আপনার? ওই যে ওই মেয়েছেলেটা, পিঠে একটা বাচ্চা, ওকে দিয়ে আপনি ইট বয়াচ্ছেন? চোখের চামড়া নেই?

লোকটি এবার কুলি রমণীটির দিকে তাকিয়ে বেশ বিরক্ত হল। ভুরু কুঁচকে বলল, তা আমি কী করব? কাজ করার সময় বাচ্চা আনে কেন?

লোকটির হ্যালবেলে ভাব দেখে অনিন্দ্য আরও রেগে গেল। বোধ হয় সে এবার মেরেই বসবে। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, আপনার নিজের বাড়িতে বাচ্চা নেই? নাকি আঁটকুড়ে? কখনো মায়ের দুধ খাননি?

লোকটি রাগল না। ঠিকাদারদের কক্ষনো পাড়ার ছেলেদের ওপর তেজ দেখাতে নেই। অমায়িকভাবে হেসে বলল, আর বলেন কেন ভাই, এদের যা কারবার! যেখানেই যাবে এণ্ডি-গেণ্ডি সব নিয়ে যাবে। জন্মায়ও তেমনি গন্ডায় গন্ডায়! এই, এই শোন, শোন, এদিকে শোন...

কুলি মেয়েটি তখন নীচে নেমে আসছিল। ঠিকাদার তাকে কাছে ডাকল। তারপর তার পিঠের বোঁচকার দিকে তাকিয়ে বলল, এটা কী? বাচ্চা, এঃ! ইতনা ছোটা বাচ্চা লেকে কাম মে কিঁউ আতা হ্যায়?

পিটপিট করে তাকিয়ে আছে শিশুটি। আট ন-মাস বয়েস হবে। চোখে রোদ লাগছে। সারামুখ লালায় মাখামাখি।

অনিন্দ্য বলল, অন্য দেশ হলে আপনার জেল হয়ে যেত!

ঠিকাদার সে-কথা গায়ে মাখল না। সেইরকম হাসিমুখেই বলল, জানেন না, এদের ধরনই এইরকম।

তারপর হাসিটা মুছে ধমক দিয়ে মেয়েটিকে বলল, যাও, ঘরে যাও! কাম নেহি করনে হোগা।

মেয়েটি ভীরু কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে আছে। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছে না।

আপনি সিগারেট খাবেন?

অনিন্দ্য বলল, না।

আপনি কোন বাড়িতে থাকেন? আপনাদের পাড়াটা খুব নিরিবিলি।

অনিন্দ্যর আর কথা বাড়াবার ইচ্ছে নেই। সে ফেরার জন্য পা বাড়াল।

একটুখানি আসবার পরই তার পিঠের জামাটায় টান পড়ল। সেই কুলিমেয়েটা ডাকল, এ বাবু!

অনিন্দ্য মুখ ফেরাতেই মেয়েটি দুর্বোধ্য ঠেট হিন্দিতে অনর্গল কী যেন বলে গেল। রাগে তার মুখখানা গনগনে। অনিন্দ্য তার কথা কিছু বুঝতে না পারলেও এটুকু বুঝতে পারল যে মেয়েটি তাকে বকছে। এমন তার বকুনির ঝাঁঝ যে অনিন্দ্য কুকড়ে যাচ্ছে প্রায়। হাত তুলে সে কিছু বোঝাবার চেষ্টা করল, কিন্তু মেয়েটি তার কথাই শুনবে না। অদূরে দাঁড়িয়ে ঠিকাদারবাবু সিগারেট টানছে। মুখে দিব্যি মিটিমিটি হাসি। মেয়েটি দৌড়ে গিয়ে ঠিকাদারবাবুর হাত ধরে টেনে আবার বকবক করতে লাগল।

ঠিকাদারবাবু বলল, আমি কী করব? এই বাবু বারন করছে! চেঁচামেচি শুনে আরও কয়েকজন মজুর-মজুরানি কাজ থামিয়ে এদিকে তাকিয়ে ছিল। এবার তারা এদিকে এগিয়ে এল, তাদের চোখ-মুখের চেহারা দেখে অনিন্দ্য বুঝল, ব্যাপার সুবিধের নয়, আর এখানে থাকার কোনো মানে হয় না। সে সুট করে কেটে পড়ল।

বাড়ি না-ফিরে অনিন্দ্য মোড়ের মাথায় এসে বাস ধরল। মুখটা তেতো লাগছে। সকাল বেলায় ভালো লাগার মেজাজটা নষ্ট হয়ে গেল। সুর কেটে গেছে, এখন অন্য একটা কিছু করা দরকার- -

সেন্ট্রাল কাফেতে পাওয়া গেল ধূতিকান্তকে। তাকে একটু আগের ঘটনাটা শুনিয়ে বলল, মাইরি প্র্যাকটিক্যালি আমাকে পালিয়ে আসতে হল। ব্যাপারটা কিছুই বুঝলাম না। অত রেগে গেল কেন?

ধূতিকান্ত হাই তুলে বলল, তোর কি আর কোনো কাজ নেই, তুই কুলি মেয়েদের পেছনে লেগেছিস? কেন, অন্য মেয়ের অভাব!

না, না, সে-কথা বলছি না।

এক-একটা সাঁওতাল মেয়েকে এক-এক সময়ে হেভি দেখতে লাগে। যাক গে শোন অরবিন্দরা কিন্তু তোর ওপর দারুণ রেগে আছে। একটু সাবধানে থাকিস!

অনিন্দ্য ওষ্ঠ উলটে বলল, যা যা, ওরা আমার ইয়ে ছিঁড়বে!

তুই সব কিছু ওরকম অবহেলা করে উড়িয়ে দিস না। ওদের একটা বছর নষ্ট হয়ে গেল। সুব্রতটাও বোকার মতন ওর মধ্যে গিয়ে পড়ল।

অনিন্দ্যর এখন মেজাজ খারাপ, এখন সে সব কিছুই অবজ্ঞা করবে। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, ওদের তো সারাজীবনটাই নষ্ট হবে। একটা বছরে কী যায়-আসে! চল, ওঠ।

ওদের পাশের টেবিলেই আরও তিনটি ছেলে বসে মৃদুগলায় কথা বলছে। অলকেন্দু, দেবজ্যোতি আর শংকর। এরা হচ্ছে খাঁটি ভালো ছেলে। এরা খারাপ কথা উচ্চারণ করে না, পরীক্ষা ভণ্ডুল করে না। এরা পৃথিবীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মাথা ঘামায়। ভবিষ্যতে এরা প্রত্যেকেই বড়ো চাকরি করবে। ধৃতির একার ইচ্ছে হল অনিন্দ্যকে ছেড়ে দিয়ে ওদের সঙ্গে বসে। কিন্তু অনিন্দ্যর হাতে একবার পড়লে আর নিস্তার নেই।

কোথায় যাবি?

চল না। শিখার সঙ্গে খানিকটা হিড়িক মেরে আসি।

৯. শিলং-এর টুরিস্ট লজের উঁচু রাস্তা

শিলং-এর টুরিস্ট লজের উঁচু রাস্তা দিয়ে দেবেন মণীশকে সঙ্গে নিয়ে হেঁটে আসছিলেন। মণীশ ঠিকমতন হাঁটতে পারছে না, দেবেন তার কাঁধের কাছের জামাটা খিমচে ধরে আছেন।

মণীশ দেবেনের চেয়ে প্রায় আধহাত বেশি লম্বা। ছিপছিপে চেহারা। মাথায় বড়ো বড়ো চুল অবিন্যস্ত। জামার বোতামগুলো খোলা।

বারান্দায় উঠে এসে দেবেন একটা ঘরে ঠকঠক করলেন। দু-টি স্ত্রীলোকের মধ্যে একজন এসে দরজা খুলে দিল, আর একজন খাটেই শুয়ে রইল।

দেবেন মণীশকে বড়ো বেতের চেয়ারটায় চেপে বসিয়ে দিলেন। মণীশের ঠোঁটে মৃদু হাসি। পকেট থেকে একটা দোমড়ানো সিগারেটের প্যাকেট বার করে একটা সিগারেট তিন-চার বারের চেষ্টায় ধরালো। তারপর এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, আপনার সামনে সিগারেট খাচ্ছি। ডোন্ট মাইণ্ড।

দেবেন বেল বাজিয়ে বেয়ারাকে ডেকে বললেন, লিম্বু হ্যায়, লিম্বু? একগ্লাস গরম পানিমে দোঠো লিম্বু ডালকে লে আও।

মণীশ বলল, আপনার কাজ-টাজ হল, দেবেন কাকা?

প্রায় হয়ে এসেছে।

স্ত্রীলোক দু-টির দিকে চোখ ফিরিয়ে মণীশ জিজ্ঞেস করল, এরা কারা?

আমার সঙ্গে বেড়াতে এসেছে। এর নাম বকুল। আর ওর নাম লাবণ্য।

যে-মেয়েটি তখনও দেওয়ালের দিকে পিঠ ফিরিয়ে শুয়ে আছে তার নাম লাবণ্য। মণীশ তার দিকে চেয়ে হো হো করে হেসে উঠল। হাসতে হাসতেই বলল, লাবণ্য? শিলং-এ লাবণ্য, হাঃ হাঃ হাঃ, নামটা পালটাতে বলুন! কোথা থেকে আবার একটা অমিত রায় জুটে যাবে। আপনি কিন্তু একটা জিনিস ঠিক বুঝেছেন, লাগে বাঙালি মেয়েছেলের খুব ডিমাণ্ড আছে।

বেয়ারা লেবুজল নিয়ে এল। দেবেন গেলাসটা মণীশের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, এটা খেয়ে নে! এতবেশি মদ খাস কেন?

মণীশ বলল, কী করব বলুন! পাহাড়ি জায়গায় সবাই মদ খায়-সন্ধ্যের পর কিছুই তো করার নেই।

তুই কাজ-টাজ কী করছিস?

কন্ট্রাক্টারি করি।

মণীশের পোশাকে চাকচিক্য আছে। দেখলে বোঝা যায়, তার হাতে কাঁচা পয়সা আছে।

সে দামি সিগারেট খায়।

কীসের কনট্রাক্টরি করিস?

যখন যা পাই। এসেছিলাম কপর্দকশূন্য অবস্থায়, কেউ পৌঁছেনি, ধর্মশালায় থাকতাম, এখন ষাট-সত্তর হাজার টাকার অর্ডার যখন-তখন নিতে পারি।

কলকাতায় আর ফিরবি না?

মণীশ এবার অহংকারীর মতন থুতনি উঁচু করে বলল, কেন ফিরব না? যখন আমি ফিরব, আমার সঙ্গে সোনা থাকবে! জানেন কার কথা? যাবো। পড়েছেন র‍্যাঁবোর জীবনী?

দেবেন চুপ করে রইলেন।

মণীশ সিগারেটের শেষ অংশ জুতোর তলায় পিষেই আর একটা সিগারেট ধরালো। তারপর বলল, ও, আপনি তো একসময় প্রফেসার ছিলেন! জানলেও জানতে পারেন। অবশ্য অনেক প্রফেসারও অশিক্ষিত থাকে। কী, থাকে না? আপনি কিন্তু খুব সেয়ানা দেবেনকাকা। ঠিক টাইমে মাস্টারি-ফাস্টারির মতন বাজে জিনিস ছেড়ে ব্যবসায় এসেছিলেন। টাকাই হচ্ছে আসল। টাকা না থাকলে মান-সম্মান নেই! আমার বাবাটাই শুধু বোকা থেকে গেল।

বাড়িতে চিঠি লিখিস না কেন?

একবার টাকা পঠিয়েছিলাম। বুড়ো রিফিউজ করেছে।

তোর বাবা একটুও বুড়ো হয়নি। নিশি যদি বুড়ো হয়, আমরা তাহলে কী?

আপনি ফিগারটা ঠিক রেখেছেন, কিন্তু ভেতরটা ফোঁপরা। আপনার নিশ্চয়ই ডায়াবিটিস আছে, চামড়া একটু কুঁচকেছে দেখছি।

দেবেন হাসলেন। ছেলেটা ধরেছে ঠিকই। মাতাল হলেও দৃষ্টিশক্তি তীক্ষ্ণ আছে।

তোর বাবা কিন্তু খুব কষ্ট পায়। কারুকে কিছু মুখ ফুটে বলে না।

কষ্ট পাওয়া যার নিয়তি, সে কষ্ট পাবেই।

তুই চল, আমার সঙ্গে কলকাতায় চল!

আপনার সঙ্গে কেন? কলকাতা কী কারুর বাপের জায়গা, না কারুর কেনা? আমার যখন ইচ্ছে যাব। র‍্যাঁবো ফিরতে পারেনি, আমি ফিরে যাব হিথক্লিপের মতন, কিংবা কাউন্ট অব মন্টেক্রিস্টো।

তুই এখনও খুব রেগে আছিস।

আপনি এক কাজ করুন দেবেনকাকা, আপনিই বরং এখানে থেকে যান। এখানকার রাস্তা ঘাটে টাকা ছড়ানো। তুলে নিতে পারলেই হয়। আমি আপনাকে ধান্দা বাতলে দেব। পাহাড়িদের ঠকানো খুব সোজা, বুঝলেন-না। আপনার মতন ধূর্ত লোক, দু-দিনে লাল হয়ে যাবেন।

তুই আমার ওপর শোধ নিচ্ছিস।

কীসের শোধ?

কলকাতায় আমি তোকে একটা চাকরি করে দিতে চেয়েছিলাম। আমি তোদের সাহায্যই করতে চেয়েছিলাম তখন।

জানি। আমার বাপ আমাকে সেই চাকরি নিতে দেয়নি। অনেষ্টি! অনেস্টি ধুয়ে জল খাবে! অনেস্টি ইজ দা লাস্ট রিসর্ট অব দা কাওয়ার্ড।

মণীশ ঘরের এখানে-সেখানে সিগারেটের ছাই ফেলছে বলে বকুল নামের মেয়েটি একটি অ্যাশট্রে নিয়ে তার পাশে রাখল। মেয়েটি কাছে আসতেই মণীশ শরীরটাকে কুঁকড়ে ফেলল। যেন কোনোক্রমে ছোঁয়া না লাগে।

মেয়ে দু-টি এপর্যন্ত নিঃশব্দ। একটিও কথা বলেনি। লাবণ্য এবার উঠে বসে বলল, পাশের ঘরের একজন লোকের খুব অসুখ।

দেবেন জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে?

হার্ট অ্যাটাক হয়েছে নাকি হঠাৎ। ডাক্তার এসেছিলেন।

মণীশ সোজা হয়ে বসে বলল, আমি বুঝি বেশিজোরে কথা বলছি।

লাবণ্য বলল, লোকটা একদম একা। সঙ্গে কেউ নেই। আমি একটু দেখে আসি ভদ্রলোককে।

লাবণ্য উঠে বেরিয়ে গেল। বকুল খাটে বসে চুল খুলল।

তোর বাড়ি কোথায়?

বাস স্ট্যাণ্ডের কাছে।

এত রাতে আর বাড়ি ফিরে কী করবি? তুই রাতটা আমার এখানে থেকে যা।

এই ঘরে?

এটা তো চারজনের ঘর। চারটে খাট আছে।

এই মেয়েদের সঙ্গে একঘরে? দেবেনকাকা, আই হেট উইমেন। আই কান্ট স্ট্যাণ্ড দেয়ার বড়ি ওডার।

দেবেন মুচকি হেসে বললেন, বকুল ইংরেজি বোঝে। বকুলও হাসছে। মণীশ তাতে একটুও অপ্রস্তুত হল না। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চলি।

ততার সঙ্গে আমার অনেক কথা ছিল।

আসলে তা নয় দেবেনকাকা, আপনি ভাবছেন, আমি মাতাল অবস্থায় ঠিকঠাক ফিরতে পারব কি না? কোনো চিন্তা নেই, শিলং-এর সব কটা ট্যাক্সিওয়ালা আমাকে চেনে। আমি ততা নাইট বার্ড।

বকুল খাট থেকে নেমে এসে মণীশের হাত ধরে বলল, কেন, এক্ষুনি চলে যাবে কেন? বোসো–

মণীশ যেন একেবারে শিউরে উঠল। ছটফট করে বলল, ছুঁয়ো না, ছাড়ো আমাকে, এই হাত ছেড়ে দাও!

বকুল বলল, কেন বাপু, আমাকে দেখলে কী এতই ঘেন্না হয়?

ছাড়ো! সরে যাও আমার কাছ থেকে। গায়ে একেবারে নরকের গন্ধ!

দেবেন বলল, ছেড়ে দাও বকুল, ছেড়ে দাও!

বকুল বলল, বাবা, এত রাগি লোক আগে কখনো দেখিনি। সবসময় রেগে রেগে কথা।

দেবেন বললেন, তাও তো ওর বাবাকে দেখনি।

হ্যাঁ দেখেছি। সেই যে আসবার সময়, বৃষ্টির মধ্যে রাস্তায় গাড়ি ঠেললেন।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি কী করে বুঝতে পারলে?

ও ঠিক বোঝা যায়। গলার আওয়াজের মিল আছে, আরও মিল আছে।

ওদের চেহারার কিন্তু মিল নেই। বাপের মতন চেহারা ছেলেরা কেউ পায়নি।

রক্তের সম্পর্ক থাকলে একটা-না-একটা মিল থাকবেই!

মণীশ বলল, রক্তের সম্পর্ক থাকলে কিছুতেই এড়ানো যায় না, না? যদি একটা রাস্তায় হারানো ছেলে হতাম! ব্লাড ইস আ সুইট জুস!

তুই কিন্তু থেকে গেলে পারতিস।

না দেবেনকাকা, চলি!

দেবেন ওর সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলেন বাইরে। তারপর আবার বললেন, অনেকগুলো ঘর খালি আছে, তুই থাকলে কোনো অসুবিধে হত না।

না!

—মণীশ, শোন! তোর বাবা আমার অনেক দিনের বন্ধু। ও তো একইরকম থেকে গেল। আমার মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় ওর জন্য কিছু করি। মানুষটা সৎ ঠিকই, কিন্তু এমন গোঁয়ারগোবিন্দ!

দেবেনকাকা, আপনি মেয়েছেলে নিয়ে এখানে ফুর্তি করতে এসেছেন, হঠাৎ পরোপকার করার ইচ্ছে জাগল কেন?

তুই ওদের যা ভাবছিস, ওরা সেরকম নয়। ওরা আমাকে সঙ্গ দেয়, কিন্তু ওরা যথেষ্ট রেসপেকটেবল। তোকে দেখে আমার খুব আনন্দ হয়েছিল, ভেবেছিলাম তোকে যদি কলকাতায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারি, তাহলে একটা সত্যিকারের কাজ হবে। নিশি আর কদ্দিন একা সংসার টানবে? তুই যাবি? এখনও যদি যাস, তোকে আমি একটা ভালো চাকরি দিতে পারি—

মণীশ এবার দেবেনের মুখোমুখি দাঁড়াল। তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, আপনি আমাকে এখনও চাকরির লোভ দেখাচ্ছেন? আর দুটো দিন অপেক্ষা করুন, তারপর আমি, এই শালা, এই মণীশ হালদারই আপনাকে চাকরি দেওয়ার ক্ষমতা রাখবে।

এই আঘাতটা দেবেন সহ্য করতে পারলেন না। মুখটা লাল হয়ে গেল। তিনি বললেন, তোর আস্পর্ধা তো কম নয়। হতভাগা মাতাল! একেবারে গোল্লায় গেছিস।

মণীশ হা-হা করে হাসতে লাগল।

দূর হ! বেরিয়ে যা আমার চোখের সামনে থেকে।

লম্বা লম্বা পায়ে বারান্দা পেরিয়ে মণীশ রাস্তায় নামল। নির্জন রাস্তা, ঝিরিঝিরি করে বৃষ্টি পড়ছে। খানিকটা টলমল পায়ে সে হাঁটতে লাগল। একটু বাদে একটা গান ধরল সে, ভাঙা ভাঙা গলায় সেই গানটা খুব দুঃখী শোনায়।

১০. মিনিবাস থেকে নেমে ইন্দ্রাণী

মিনিবাস থেকে নেমে ইন্দ্রাণী রাস্তা পার হয়ে এল সিনেমাহলের সামনে। ভাস্কর আগে। থেকেই দাঁড়িয়েছিল, ভিড়ের থেকে একটু দূরে।

ইন্দ্রাণী জিজ্ঞেস করল, আর কেউ আসেনি?

আর কে আসবে?

তুমি যে বলেছিলে রুমা, শম্পা, অরুণদেরও টিকিট কাটবে।

শেষপর্যন্ত আর ওদের খবর দেওয়া হয়নি।

তুমি বড্ড কিপটে হয়ে যাচ্ছ কিন্তু।

ওদের আর একদিন দেখাবো।

ফিলম শুরু হয়ে গেছে, ওরা অন্ধকারের মধ্যে গিয়ে বসল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভাস্কর ইন্দ্রাণীর একটা হাত তুলে নিল নিজের হাতে। সারাক্ষণ সেই হাতটা নিয়ে খেলা করতে লাগল।

ছবি শেষ হওয়ার পর বাইরে বেরিয়ে এসে ভাস্কর জিজ্ঞেস করল, ছোটোমাসিকে বলে এসেছিস তো?

ইন্দ্রাণী বলল, বাঃ, বলব না?

যাক তাহলে ছোটোমাসি চিন্তা করবেন না। এক্ষুনি বাড়ি ফেরার দরকার নেই। গঙ্গার ধারের রেস্টুরেন্টটায় খেতে যাবি?

একঘেয়ে হয়ে গেছে জায়গাটা।

কলকাতা শহরে বেশি জায়গা তো নেই। আর এক কাজ করা যায়। আমাদের বাড়িতে গিয়ে কিছুক্ষণ গল্প করা যেতে পারে। বাড়ি ফাঁকা।

কেন ফাঁকা কেন?

মা-বাবা তো পরশু পুরী গেলেন। ইন্দ্রাণী একটু চিন্তা করে বলল, না, ঘরের মধ্যে বসে থাকার চেয়ে ফাঁকায় বেড়ানোই ভালো। গঙ্গার ধারে চলো।

ভাস্কর আজ মোটরবাইক আনেনি। ইন্দ্রাণীকে নিয়ে মোটরবাইকে বেড়ানো তার অনেক দিনের শখ। শেষমুহূর্তে গাড়িটা গড়বড় করল। এখন ট্যাক্সিই ভরসা।

কিন্তু ট্যাক্সি পাওয়া যায় না। ভাস্কর এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করছিল, এমন সময় বৃষ্টি এসে গেল। এমন প্রবল বৃষ্টি যে, আওয়াজে কান ধাঁধিয়ে যায়। গাড়ি বারান্দার নীচে দাঁড়ালেও ছাঁট এসে ভিজিয়ে দেয়। আধ ঘণ্টা এইরকম বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে বেড়াবার মেজাজই নষ্ট হয়ে গেল।

তারপর সামনে একটা বাস এসে দাঁড়াতেই ভাস্কর ইন্দ্রাণীর হাত ধরে টেনে বলল, উঠে পড় উঠে পড়।

হাজরার মোড়ে এসে ভাস্কর ইন্দ্রাণীকে নিয়ে নেমে পড়ল। বৃষ্টি একেবারে থামেনি, তবে তেজ কমে গেছে।

ভাস্করদের বাড়ির গলির মোড়ে এসে ভাস্কর বলল, ইন্দ্রাণী, তুই এখানে একটু দাঁড়া, আমি আগে চলে যাই—তুই বরং একটু বাদে, এই মিনিট দু-এক পরে আসবি।

ইন্দ্রাণী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, কেন?

একতলায় বাড়িওয়ালারা থাকে তো! ওরা সব কিন্তু প্যাট প্যাট করে দেখে, কে আসছে, কে যাচ্ছে।

দেখলে কী হয়েছে?

ওরা তো বুঝতে পারবে না তুই আমার বোন। ওরা ভাববে রাত নটার সময় আমার সঙ্গে কোনো মেয়ে আসছে।

কোনো মেয়ে যদি তোমার কাছে আসেই, তাতেই বা কী হয়েছে?

আমার কাছে কোনো মেয়ে কখনো আসে না।

বাজে বোকো না, চলো–

সিঁড়িটা অন্ধকার। ভাস্কর তালা খুলতে পারছে না। পকেট থেকে দেশলাই বার করে ইন্দ্রাণীকে দিয়ে বলল, তুই একটা কাঠি জ্বালিয়ে ধর তো!

সেই অল্প আলোয় দেখা গেল ভাস্করের হাত কাঁপছে। সে ঠিক উত্তেজিত নয়, বরং যেন ভয় পেয়েছে খানিকটা।

ইন্দ্রাণী বলল, ঠাকুর-চাকরও কেউ নেই?

সবাইকে ছুটি দিয়ে দিয়েছি।

তোমায় কে রান্না করে দেয়?

নিজেই রান্না করছি। একদম পুরোপুরি একা থাকতে বেশ লাগে কিন্তু। মায়ের তীর্থযাত্রার বাতিক হয়েছে বলে, আজকাল আমি প্রায়ই একা থাকি।

ভেতরে এসে আলো জ্বালাবার পর ইন্দ্রাণী বলল, তোমার রাত্রির রান্না হয়ে গেছে? না, এখন রাঁধতে হবে?

ওবেলার খিচুড়ি আছে। দুটো ডিম ভেজে নেব। তুই খাবি একটু খিচুড়ি?

নাঃ তুমি কি শুধু খিচুড়িই খাচ্ছ নাকি?

হ্যাঁ, ওটাই সোজা। রান্নার জন্য বেশি সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না।

ইন্দ্রাণী বসবার ঘরে না ঢুকে চলে এল ডান দিকের কোণের ঘরটায়। এটা ভাস্করের নিজস্ব ঘর। ঠিক আগেরই মতন নোংরা আর অগোছালো আছে।

ইন্দ্রাণী অনেকদিন বাদে এল এবাড়িতে। মাঝখানে ভাস্করের বাবার অসুখের সময় একবার এসেছিল। বছর চারেক আগে এই ঘরে মণীশ এসে প্রায়ই থাকত।

খাটের পাশে অনেকগুলো ফ্রেম না-করা ছবি জমা করা। যে কাপগুলোতে ভাস্কর রং গুলত–সেগুলোতে ধুলোর সর পড়ে আছে। ভাস্কর নিজের ঘরের দেওয়ালে কোনো ছবি টাঙায় না। একটা ক্যালেণ্ডারও না।

তুমি নতুন কোনো ছবি আঁকছ না?

কী হবে?

ইন্দ্রাণী হঠাৎ রাগের সঙ্গে বলে উঠল, কী হবে মানে কী! শুধু চাকরি করে আর ক্লাবে তাস খেলেই বা কী হবে?

অন্য লোকেরা তো এইসবই করে।

তোমার আলাদা কিছু হওয়ার কথা ছিল।

আমি হেরে গেছি।

কার কাছে?

কী জানি!

এ-রকম কথা আমার শুনতে ভালো লাগে না। ধোঁয়াটে ধোঁয়াটে কথা।

এবার বল তো তুই কী করছিস? এম. এ. পাশ করে বাড়িতে বসে আছিস, কবে বিয়ে হবে সেই অপেক্ষায়! মেয়েদের বুঝি কিছু করার থাকে না?

আমার তো সেরকম কোনো গুণ নেই।

তুই গান শিখতে শিখতে ছেড়ে দিলি কেন?

ইন্দ্রাণী চুপ করে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, মাঝখানে অনেকদিন যাইনি তো, তারপর আবার যেতে কীরকম লজ্জা করল। আচ্ছা বুগুনদা, মানুষ কীজন্য বাঁচে? শুধু বেঁচে থাকার জন্য?

আনন্দ পাওয়ার জন্য।

কীসে আনন্দ পাওয়া যায়।

এক-একজন এক-একটাতে। কেউ টাকা রোজগার করে, কেউ ছবি এঁকে, কেউ গান গেয়ে, কেউ অন্যকে ঠকিয়ে...মণীশ তোকে চিঠি লেখে?

না।

মণীশ অসমে থাকে এখন, তুই জানিস নিশ্চয়ই।

জানি। যাই বল, তোমার ছবি আঁকা ছেড়ে দেওয়ার কোনো মানে হয় না।

মণীশকে আমি কিছুই বলিনি।

তোমার আগেকার ছবিগুলো এমন অযত্নে ফেলে রেখেছ কেন?

তুই ওই দেওয়ালটার পাশে গিয়ে বোস, তোর ছবি আঁকি।

আমার, তুমি তো রিয়েলিস্টিক ছবি আঁক না।

তা বলে কী আঁকতে পারি না? গতবছর কিছু এঁকেছিলাম।

দেখাও–

খাটের তলা থেকে ভাস্কর কিছু ছবি টেনে বার করল। সব ক-টাই আদিম অরণ্য আর আদিম মানুষদের গাঢ়রঙের ছবি। রুশোর প্রভাব স্পষ্ট।

এক-একখানা করে ছবি ইন্দ্রাণী খুব মন দিয়ে দেখতে লাগল। প্রত্যেকটা ছবির মধ্যেই একটা শান্তির ভাব আছে। প্রায় নগ্ন নারী পুরুষগুলির প্রত্যেকের মুখই হাস্যময়।

ইন্দ্রাণী বলল, তোমার এ-রকম ছবি তো কখনো দেখিনি। আগেকার ছবি দেখে মানেই বুঝতে পারতাম না। হঠাৎ এগুলো আঁকলে কেন?

এমনিই ইচ্ছে হল এইসব মানুষদের আঁকতে–যাদের কোনো সমাজ ছিল না।

ইন্দ্রাণী গম্ভীর হয়ে গেল।

ভাস্কর বলল, আমার এখন আর শহরের জীবন ভালো লাগে না। সব কিছু ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে যদি কোনো নির্জন জায়গায় থাকতে পারতাম। হয়তো মণীশই ভালো করেছে।

আমি এবার বাড়ি যাব না?

আর একটু বোস। খিদে পেয়েছে! আমি ডিমভাজা আর চা করে দিতে পারি।

না, কিছু দরকার নেই।

জানলায় ছিটকিনি লাগানো নেই; বাতাসে একটা পাল্লা খুলে যাচ্ছে আর ঢাকাস চকাস শব্দ করে বন্ধ হচ্ছে। জল-মেশানো হাওয়ায় একটা স্নেহময় ভাব। ভাস্কর উঠে গিয়ে জানলার দুটো পাল্লাই খুলে দিল। তারপর বলল, বৃষ্টি বেশ জোরে এসেছে আবার। রাস্তায় জল জমে যাবে।

এরপর আমি ফিরব কী করে?

ভাস্কর ইন্দ্রাণীর চোখের দিকে দৃষ্টি স্থির রেখে বলল, না ফিরলে হয় না? তুই আজ রাতটা এখানেই থেকে যা, আমি নীচতলা থেকে ছোটোমাসিকে ফোন করে জানিয়ে দিচ্ছি।

দু-জনে অপলকভাবে পরস্পরের দিকে চেয়ে রইল কয়েকটি মুহূর্ত। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ইন্দ্রাণী উঠে দাঁড়িয়ে বলল, বাড়িতে ছাতা আছে নিশ্চয়ই। চলো বেরিয়ে পড়ি।

তুই আয় জানলার কাছে। দেখ একবার, এই বৃষ্টিতে ছাতা নিয়েও কোনো লাভ নেই।

ইন্দ্রাণী জানলার সামনে ভাস্করের পাশে এসে দাঁড়াল। বাইরে বৃষ্টির মোহময় ঝমঝমে শব্দ। রাস্তায় একটিও লোক নেই, সমস্ত শহরটাই যেন নীরবে স্নান করছে। জল জমছে আস্তে আস্তে।

চলো রাস্তায় বেরিয়ে ভিজবে?

আমি কি সত্যিই তোকে এখানে রাত্তিরে থাকতে বলছিলাম নাকি? আর একটু পরে ফিরলেই হবে। তুই এখানে জানলার দিকে পাশ ফিরে একটু দাঁড়া, তোর একটা স্কেচ করি। রিয়েলিস্টিক ড্রয়িং এখনও একেবারে ভুলে যাইনি।

ভাস্করই ইন্দ্রাণীর কাঁধ ধরে পাশ ফিরিয়ে দিল। কিন্তু তক্ষুনি ছবি আঁকার বদলে সে ইন্দ্রাণীর গালে হাত রেখে মুখটাকে অনুভব করতে লাগল। যেন ঠিক ভঙ্গিটা আসছে না। ইন্দ্রাণীর কাঁধের আঁচলটা একটুখানি সরালো।

তারপর কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে বলল, আমার খুব মন খারাপ লাগছে। তুই এত সুন্দর!

দ্রুত আবার এগিয়ে এসে সে ইন্দ্রাণীর থুতনি ধরে মুখটা উঁচু করল। চোখের ওপর তীব্র চোখ রেখেও দয়াপ্রার্থীর মতন বলল, একবার।

ইন্দ্রাণী কোনো আপত্তি করল না। ভাস্কর তার চোখে, নাকে ও ঠোঁটে ঠিক এগারোটা চুম্বন দিল। তারপর তার কাঁধের ওপর মাথাটা রাখল।

ইন্দ্রাণীর চোখ দিয়ে জল পড়ছে।

ঠিক এইরকম অবস্থায় মণীশ ওদের একদিন দেখেছিল। তখন সবাই জেনে গেছে যে মণীশের সঙ্গেই ইন্দ্রাণীর বিয়ে হবে। মণীশ প্রাণপণে চাকরি খুঁজছে। প্রত্যেক দিন সে সন্ধ্যে বেলা ইন্দ্রাণীকে নিয়ে কোথাও-না-কোথাও বেরিয়ে যায়। ভাস্করকে সে বলে রেখেছে আমার জন্য একটা ফ্ল্যাট দেখে রাখিস তো! চাকরি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি সব ব্যাপারটা সেরে...। চাকরি পাওয়া না ফ্ল্যাট পাওয়া—কোনটা যে বেশি শক্ত বুঝতে পারছি না!

এইরকমই এক বৃষ্টির দিনে সন্ধ্যে বেলা ভাস্কর এসেছিল ইন্দ্রাণীর কাছে। প্রথমে ঠাট্টা ইয়ার্কি করতে করতে বলেছিল, সব তো ঠিক হয়ে গেল রে, এবার শাঁখ বাজালেই হয়। ফ্ল্যাট দেখা হয়ে গেছে, চাকরিও শিগগিরই পেয়ে যাবে মণীশ, ভালো মাইনে, দেবেন ঘোষের ফার্মে—ওর বাবাই যা একটু আপত্তি করছেন-

তারপর হঠাৎ ইন্দ্রাণীর দুই কাঁধে হাত রেখে বলেছিল, তোকে আমি কী করে ছেড়ে দেব বল তো? কিছুতেই ছেড়ে দিতে পারব না! ইন্দ্রাণী, তুই আমাকে একটুও ভালোবাসিস না!

ইন্দ্রাণী, চুপ করেছিল। কী উত্তর দেবে? ভালোবাসা ঠিক কাকে বলে? ভাস্কর আর মণীশ দু-জনে দু-রকম—এদের কারুর প্রতিই তো তার টান কম নয়। অথচ নারীকে শুধু একজন পুরুষেরই হতে হবে।

ভাস্করের বাবা-মা তার ওপরেই নির্ভরশীল, সেইজন্য সে ছবি আঁকাতেই পুরোপুরি মগ্ন হতে পারেনি, তাকে চাকরি নিতে হয়েছে। সে ইন্দ্রাণীকে পেতে পারে না।

সেদিন ভাস্কর অনেকদিন বাদে আবার ইন্দ্রাণীকে চুমোয় চুমোয় আচ্ছন্ন করে দিয়েছিল। যেন শেষবার। যেহেতু ভাস্কর সঙ্গে সঙ্গে কাঁদছিল, তাই ইন্দ্রাণী বাধা দিতে পারেনি। ভাস্কর যখন বুকে মুখ রেখেছে, তখন দরজার কাছে দাঁড়াল মণীশ। দেখা দেয়নি, সঙ্গে সঙ্গে সরে গিয়েছিল। নিজের বুকেই হাত বুলোচ্ছিল বার বার। একদিন সে তার গেঞ্জিহীন বুক ইন্দ্রাণীকে দেখিয়ে বলেছিল, দেখতে পাচ্ছ, কী লিখে রেখেছি এখানে? মণীশ বার বার নিজের বুকটা চুলকে যেন তুলে ফেলতে চাইছিল সেকথা।

ভাস্করের মাথাটা আলতোভাবে উঁচু করে তুলে ইন্দ্রাণী বলল, বুগুনদা, শোনো-।

ভাস্কর অপেক্ষা করতে লাগল।

ইন্দ্রাণী থেমে গেছে হঠাৎ। এক আঙুল দিয়ে চোখের জল মুছছে।

ভাস্কর জিজ্ঞেস করল, কী?

আমরা পারব না!

কী পারব না?

কথা রাখতে। আমরা যখনই কাছাকাছি আসি—

ভাস্কর হঠাৎ উত্তেজিতভাবে বলল, এতে কোনো দোষ আছে? আমি অনেক ভেবে দেখেছি! এসব পুরোনো সামাজিক নিয়ম, কোনো মানে হয় না! আমি তোকে ছাড়তে পারব না-

তোকে ছাড়া আর অন্য কোনো মেয়েকে আমার ভালো লাগে না– আমরা যদি রেজিষ্ট্রি করি–

না, বুগুনদা, তুমি তা পার না।

কেন?

ভালো করে ভেবে দেখো।

আমি অনেক ভেবে দেখেছি। কেন, মণীশের জন্য?

আমি খারাপ মেয়ে, তুমি জানো... ওসব পুরোনো কথা, ওসবের কোনো মানে হয় না। একদম মন থেকে মুছে ফেল। মুছে ফেলা যায় না। ইন্দ্রাণী মুখ নত করতেই ভাস্কর ব্যাকুলভাবে তার বাহু ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল, ইন্দ্রাণী, ইন্দ্রাণী আমার দিকে দেখ একবার।

ইন্দ্রাণী আর দেখবে না। সে কান্না সামলাতে পারছে না কিছুতেই। ভাস্কর জোর করে তার মুখটা উঁচু করে ঠোঁট দিয়ে ইন্দ্রাণীর চোখের জল চেটে নিতে লাগল।

১১. নাসিরুদ্দিন প্রথমটা ঠিক বুঝতে পারেনি

নাসিরুদ্দিন প্রথমটা ঠিক বুঝতে পারেনি। জলের মধ্যে আওয়াজ শুনে পেছন ফিরে তাকিয়েছিল, তারপর বিবর্ণ মুখে চেঁচিয়ে উঠল, বাবু!

নিশানাথ স্থিরচোখে তাকিয়ে আছেন জলের দিকে। তাঁর ছেলে প্রথমে জলের মধ্যে প্রবল তোলপাড় তুলে ডুবে গেল একেবারে। এবং কয়েক মুহূর্ত বাদেই আবার ভেসে উঠল। তার কালো চুলভরা মাথাটা দেখা যেতেই নাসিরুদ্দিন হালটা নামিয়ে রেখে লাফাবার জন্য তৈরি হল।

নিশানাথ হাত তুলে তাকে বাধা দিয়ে বললেন, মাঝি, তুমি থাকো।

নিশানাথ ঝট করে জামাটা খুলে লাফিয়ে পড়লেন জলে। পায়ের প্রচন্ড ধাক্কায় নৌকোটা প্রায় উলটে যাচ্ছিল। বুড়ো মাঝি কোনোরকমে সামলাল।

নিশানাথ লম্বা লম্বা হাতে জল কেটে এগিয়ে যেতে লাগলেন। স্রোতের খুব টান, সুব্রত ভেসে গেছে অনেকটা। নিশানাথ কাছে এসে সুব্রতর চুলের মুঠি চেপে ধরলেন। সেই স্পর্শেই সুব্রত হাঁকুপাঁকু করে দু-হাতে জড়িয়ে ধরতে এল বাবার গলা। নিশানাথ নিজেকে সরিয়ে নিয়ে খুব জোরে একটা চড় মারলেন ছেলেকে।

সুব্রতর নাকটা আছে জলের মধ্যে। মাথাটা কিছুতেই তুলতে পারছে না। নিশানাথের হাতের ঝাঁকুনিতে একবার মাথাটা জল থেকে সামান্য উঁচু হতেই সে আঁহ আহ শব্দ করে বুকভরে নিঃশ্বাস নিতে চাইল। অর্ধস্ফুট গলায় বলল, বাবাঃ-

নিশানাথ তার চুলের মুঠি ধরে মাথাটা আরও দু-একবার উঁচুতে তুলে ঝাঁকাতে লাগলেন, আর বলতে লাগলেন, দেখ মরা কাকে বলে! দেখ!

সুব্রত কিছুই শুনতে পাচ্ছে না। তার চিন্তা করারও শক্তি নেই। সে শুধু কোনো একটা জিনিস ধরতে চায়। জলকে ধরা যায় না। হাতের কাছে একটা কাঠ পেলেও সে চেপে ধরত প্রাণপণে। তার বদলে একজন মানুষকে পেয়েছে, তার বাবা।

সে বার বার ধরতে যাচ্ছে। নিশানাথ তাকে দূরে সরিয়ে রাখছেন। জলে ডোবা মানুষের মুষ্টি কী সাংঘাতিক হয় তিনি জানেন। কোনোরকমে ছেলেটাকে উলটে ফেলা দরকার। কিন্তু সুব্রত হাঁকুপাঁকু করছে ভীষণভাবে। এক-একবার মুখ তুলছে আর চিৎকার করছে সেইভাবে। এত স্রোতের মধ্যে এইভাবে ধরে রাখা যায় না। ওকে অজ্ঞান করে ফেলা দরকার।

কয়েকবার নিশ্বাস নিয়ে সুব্রতর গায়ে একটু জোর ফিরে এসেছে। সে আবার দু-হাত বাড়িয়ে দিল বাবার দিকে। এবার ধরতে পেরেছে। সাঁড়াশির মতন আঙুল দিয়ে সে নিশানাথের টুঁটি আঁকড়ে ধরল।

নিশানাথ প্রচন্ড শক্তিতে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করতে লাগলেন। সুব্রতর গায়ে এখন যেন। অসুরের শক্তি এসে গেছে। সে আর কিছুতেই ছাড়বে না।

নিশানাথের দম আটকে এসেছিল, তিনি নিজেকে ছাড়াবার জন্য প্রচন্ড চেষ্টা করতে লাগলেন। পারছেন না। একটা অক্টোপাসের অনেকগুলো হাত যেন তাঁকে চেপে ধরেছে, একবার ডুবে গিয়ে তিনি অনেকখানি জল খেলেন–কোনোক্রমে আবার মুখ তুলে বললেন, ছাড়, ছাড়–

সুব্রত ছাড়ল না। সে আর কিছুতেই ছাড়বে না, সে বাঁচতে চাইছে। নিশানাথ কোনোক্রমে মাথা তুলে সুব্রতর পেটে এক লাথি মারলেন। সেই ধাক্কায় সুব্রত ছিটকে বেরিয়ে গেল। আবার ডুবেই যাচ্ছিল, নিশানাথ দ্রুত এগিয়ে এসে সুব্রতর জামাটা ধরে ফেললেন। হাতটা

যতখানি লম্বা করা যায়, ততখানি দূরে ওকে সরিয়ে রাখলেন। তারপর স্রোতের সঙ্গে দু জনেরই শরীরটা ভাসিয়ে রেখে অন্য হাতে সমস্ত জোর দিয়ে ঠাস ঠাস করে মারতে লাগলেন সুব্রতর ঘাড়ে।

সুব্রত মার খেয়ে আঁক আঁক শব্দ করতে লাগল, একটু দম পেতেই বলতে লাগল, বাবা, আর করব না, বাঁচিয়ে দিন, আপনার পায়ে ধরছি...

–মরতে চেয়েছিলি না? দেখ মরা কাকে বলে?

সুব্রত ঘোলাটে চোখে বাবাকে দেখবার চেষ্টা করল। নিশানাথ তখনও তাকে কাছে আনলেন না। বললেন, একদম নড়াচড়া করবি না। একটু নড়লেই মার খাবি–

সুব্রতর চোখের জল মিশছে নদীতে, নিশানাথ একটু থামতেই সে ফোঁপাতে লাগল, আমি মরে যাব। আমি মরে যাব। নিশানাথ আর একটা ঝাঁকুনি দিয়ে থামিয়ে দিলেন তাকে।

তিনি সুব্রতর দেহটা উলটে চিত করে দিলেন। নিজেও চিত হয়ে সুব্রতর মাথাটা টেনে এনে নিজের বুকের ওপর রাখলেন।

ওপরে আকাশ কালো হয়ে আছে। বৃষ্টির বড়ো বড়ো ফোঁটা এসে পড়ছে মুখে। যেন জলের একটা অতিকায় প্রাণী বহন করে নিয়ে যাচ্ছে তার সন্তানকে। হাঁটতে শেখার পর আর সন্তানের মাথার স্পর্শ নিশানাথের বুকে লাগেনি। তিনি বড়ো বড়ো নিশ্বাস ফেলতে লাগলেন।

নাসিরুদ্দিন নৌকোটা কাছে নিয়ে এসেছে। বইঠাটা বাড়িয়ে দিল নিশানাথের দিকে। নিশানাথ সেটা ধরে ফেলে নৌকোর সঙ্গে শরীরটাকে সমান্তরাল করে ফেললেন, তারপর বললেন, তুমি একে আগে উঠিয়ে নাও।

সুব্রতর তখনও অজ্ঞানের মতন ঘোরলাগা অবস্থা। নিজে থেকে ওঠার ক্ষমতা নেই। নিশানাথ তার কোমরটা ঠেলে উঁচু করে তুললেন। বুড়ো মাঝি তার মাথাটা তুলে দিল

গলুইয়ের ওপর। তারপর যেমনভাবে বড়ো মাছ ওঠানো হয়, সেইভাবে তোলা হল সুব্রতকে।

তারপরও নিশানাথ নৌকোর গা ধরে ভাসতে লাগলেন। তিনি উঠতে ভরসা পাচ্ছেন না। তার এত বড়ো শরীরটা তোলার সময়কার ঝাঁকুনিতে নৌকোটা উলটে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি।

তিনি মাঝিকে বললেন, তুমি যদি নৌকোটা একা চালিয়ে নিয়ে যেত পার, তাহলে আমি পাশে পাশে সাঁতরে চলে যাব।

নাসিরুদ্দিনের মুখখানা অপ্রসন্ন, সে বেশ ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, এই সময়ডার পানিতে খুব কামঠ লাগে।

নিশানাথ নদীর দিকে আর একবার তাকালেন। ছোটো জাতের কুমিরগুলো সাধারণত এত গভীর জলে আসে না, তবু বলাও যায় না, মাঝিরাই ভালো জানবে।

কিন্তু নৌকোটা যদি সবসুদ্ধ উলটে যায়?

নাসিরুদ্দিন বলল, যাবে না, আপনি ওঠেন তো।

নাসিরুদ্দিন সুব্রতকে ঠেলে নিয়ে গেল একদিকে। নিজেও সে সেইদিকে কাত হয়ে রইল। নিশানাথ নৌকোর ধারটায় যত দূর সম্ভব কম চাপ দিয়ে প্রায় যেন লাফিয়েই উঠে এলেন জল থেকে। তাঁর অত বড়ো শরীরের চাপে দু-টি পাটাতন ভেঙে গেল মচাং করে। এবং অন্য একটিতে তাঁর থুতনি ঠুকে গেল বেশ জোরে। কেটে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে রক্ত পড়তে লাগল। দরদরিয়ে।

নাসিরুদ্দিন বলল, বাবু, আপনে কি আমারেও মারতে চান? নিশানাথের খুব জোর লেগেছে। চোখ বুজে মুখটা কুঁচকে রেখে তিনি ব্যথাটা সামলাবার চেষ্টা করছেন। একটু বাদে তিনি চোখ খুলে বললেন, তুমি আমাকে মাপ করে দাও।

আমার ঘরে বালবাচ্চা নেই, জরুর নেই, আমি একলা মানুষ আমি আপনাদের রীত পৃকিতি কিছু বুঝি না। তবু আপনি আমারে আজ এতবড়ো ভয়্ডা দেহালেন।

তুমি একটু বেশি ভয় পেয়েছিলে মাঝি। আমি জানতাম, কিছু হবে না।

নিশানাথের রক্ত বন্ধ হচ্ছে না। তাঁর বুকের ওপর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে রক্ত। রক্ত কখনো সোজা যায় না। এঁকেবেঁকে নিজস্ব একটা পথ তৈরি করে নেয়। নিশানাথ হাত দিয়ে থুতনিটা চেপে ধরে রইলেন।

সুব্রত স্থির হয়ে শুয়ে আছে। সে-দিকে চোখ পড়তেই তিনি বললেন, নাসিরুদ্দিন দেখো তো ছেলেটার পেটে জল ঢুকেছে কিনা! নাসিরুদ্দিন কোনো উত্তর না দিয়ে সুব্রতর কাছে এসে পড়ল। তারপর তার পিঠের দু-দিকে হাত দিয়ে চাপ দিতে লাগল। ওই শীর্ণ হাতেও বেশ শক্তি আছে, কারণ চাপ লাগতেই সুব্রত একটা শব্দ করে উঠল। কিন্তু তার পেটে জল ঢোকেনি, কিছুই বেরোলো না। শুধু সে দুর্বল বোধ করছে।

নিশানাথ কাছে এসে সুব্রতর পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলতে লাগলেন, ঠিক হয়ে যাবে, এক্ষুনি ঠিক হয়ে যাবে!

বাবার হাতের সেবা পাওয়ার অভ্যেস নেই সুব্রতর। মাথাটা একটু পরিষ্কার হতেই সে বেশ অস্বস্তি বোধ করল। উঠে বসল আস্তে আস্তে। দেখল বাবার থুতনি ও বুক রক্তে মাখামাখি। সে কিছুই বলল না। কী বলবে?

নিশানাথ বার বার হাতের তেলো দিয়ে রক্ত মুছছেন। ফিরে গেলেন গলুইয়ের কাছে।

সুব্রত উবু হয়ে বসে রইল নৌকোর খোলের মধ্যে। ফাঁকা ফাঁকা দৃষ্টি। মাঝে মাঝে সে যেন বেশি শীত লাগার মতন কেঁপে উঠছে। কাছেই জলে আলোড়ন তুলে একটা প্রাণী মাথা তুলেই আবার ডুব মারল। নিশানাথ সুব্রতকে খানিকটা সান্ত্বনা দেওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, ওটা শুশুক, ভয়ের কিছু নেই।

নিশানাথ এখনও বইঠা ধরেননি বলে নৌকোটা স্রোতের সঙ্গে সঙ্গেই ভাসছে। বাতাসের বেগ একটুও কমেনি। আকাশের চেহারা একইরকম খারাপ। বুড়ো মাঝি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আজ বুঝি গালাম!

নিশানাথ বইঠাটা তুলে নিয়ে বললেন, কিছু হবে না, ঠিক পৌঁছে যাব।

ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুই ছইয়ের মধ্যে গিয়ে শুয়ে পড়।

সুব্রত নড়ল না।

নিশানাথ এগিয়ে এসে তার হাত ধরে টেনে বললেন, ওঠ। শুধু শুধু বৃষ্টিতে ভিজে কী হবে!

সুব্রতকে তিনি নিয়ে গেলেন ভেতরে। ছইয়ের সঙ্গে ঝুলছে মাঝির ছেড়া গামছা। সেটাই তুলে নিয়ে বললেন, এটা দিয়ে মাথাটা অন্তত মুছে নে।

তারপর তিনি গলুইয়ে ফিরে গিয়ে বইঠা নিলেন। একবার ডান দিকে, একবার বাঁ-দিকে জল টেনে টেনে নৌকোটা সোজা করার চেষ্টা করতে লাগলেন। তবু নৌকোটা ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে। তিনি অবাক হয়ে ওদিকে তাকিয়ে দেখলেন, বৃদ্ধ মাঝি হাল থেকে হাত তুলে নিয়েছে।

সে বলল, আমার আর শক্তি নাই, বাবু।

একেই বলে হাল ছেড়ে দেওয়া। নিশানাথ ভাবলেন, নাসিরুদ্দিন তাঁকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছে। তিনি একটু হেসে বললেন, আরে মিঞা, আর একটুখানি ধরো। এ-রকম করলে নৌকো যাবে কী করে?

যেখানে যায় যাক।

আরে তুমি কি পাগল হলে নাকি? যা বলছি শোনো!

বাবু, দুনিয়ায় আমার কেউ নাই, আমি কার বান্দা?

নাসিরুদ্দিন, হালটা ধরো শিগগির, নৌকো ঘুরছে।

আর পারি না। শক্তি নাই! পেটের মধ্যে সেই ব্যথাটা...

কথার অবাধ্য হলে মাথাটা ফাটিয়ে দেব তোমার।

মাঝি হা-হা করে হেসে উঠল।

মধ্যনদীতে ঝড়-জলের মধ্যে এই কৌতুক নিশানাথের পছন্দ হল না। এ-রকমভাবে নৌকো সামলানো যাবে না। তিনি তো একাই হাল আর দাঁড় দুটোই নিতে পারেন না। লোকটা কী সত্যিই পাগল হয়ে গেল নাকি? কিন্তু যে-লোক সারাজীবন নৌকো চালাতে চালাতে বুড়ো হয়ে গেল, সে একদিনের ঝড়-বৃষ্টিতে ভয় পাবে কেন? যতই পেটের ব্যথা হোক, এখন হাল ধরে নৌকো না সামলালে যে ভরাডুবি হবে!

নিশানাথকে আবার বইঠা তুলে রেখে এদিকে আসতে হল। মাঝির মুখের কাছে ঝুঁকে ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে তোমার?

হালটার ওপর মাথা রেখে নাসিরুদ্দিন বলল, এ যাত্তারায় আর বুঝি ফেরা হল নি! আমার তাগৎ সব গেছে।

নিশানাথ ওর গা ছুঁয়ে দেখলেন, ওর গায়ে দারুণ জ্বর। চোখ দু-টি ঘোলাটে হয়ে আসছে।

এই প্রথম নিশানাথ অসহায় বোধ করলেন।

জলে ভেজার জন্য কোনো মাঝির কখনো জ্বর হয়েছে বলে তিনি শোনেননি। তাহলে তো মাছেদেরও জ্বর হওয়ার কথা। কিন্তু এই লোকটা সত্যিই অসুস্থ।

সুব্রত জুলজুলে চোখে সব কিছু দেখছে। যেন একটা রোমহর্ষক নাটক। এর শেষ পরিণতি জানার জন্য সে উদগ্রীব। বোধ হয় নৌকোটা ভাসতে ভাসতে সমুদ্রে চলে যাবে। কিংবা উলটে যাবে যেকোনো সময়। আর কোনোদিন সে মাকে কিংবা শিখাকে দেখতে পাবে না।

তুই হালটা ধরতে পারবি?

সুব্রত চমকে উঠে ফ্যাকাশে গলায় বলল, আমি? আমি তো জানি না কী করে–

আমি শিখিয়ে দিচ্ছি।

সাঁতার না-জানা যে-মানুষ হঠাৎ জলে পড়ে যায়, সে মানসিক ধাক্কায় শারীরিকভাবেই অনেকক্ষণ অবসন্ন হয়ে থাকে। সুব্রতর হাত-পায়ে একটুও জোর নেই এখন। বুকের ধড়ফড়ানিটা এখন কমলেও ভেতরটা যেন একেবারে খালি। তবু উঠে বাইরে বেরিয়ে এল।

নিশানাথ বললেন, মাঝি তুমি ভেতরে গিয়ে শুয়ে পড়ো।

নাসিরুদ্দিন মাথা নেড়ে বলল, এ খোকাবাবুডা পারবে না। ই কি কেউ একদিনে শেখে?

তবু কিছু একটা করতে হবে তো!

এ যাত্তারা আর ফেরা হলনি। ছেড়ে দেন।

নিশানাথ হালের ডগাটা শক্ত করে ধরে আছেন। কড়া গলায় বললেন, সরো।

এইসব লোকের কথাবার্তা তিনি একদম বোঝেন না। এরা যখন-তখন হার স্বীকার করতে চায়। এটা কী মানুষের ধর্ম? নদীর ওপরে একটা নৌকো স্রোতে ভাসছে–এটা যদি-বা যতক্ষণ উলটে না যায়, ততক্ষণ এটাকে পাড়ে পৌঁছোবার শেষ চেষ্টা করতে হবে না?

মাঝি একটু সরে যেতেই নিশানাথ সুব্রতকে সেই জায়গায় বসালেন। তারপর বললেন, দু হাত দিয়ে শক্ত করে ধর।

নির্দেশমতন সুব্রত দু-হাত দিয়ে হালটাকে চেপে ধরল। নাসিরুদ্দিন ক্লান্তভাবে হেসে বলল, ও পারবে না।

সে-কথা অগ্রাহ্য করে নিশানাথ ছেলেকে বললেন, তুই হাল চালাতে পারবি না ঠিকই, কিন্তু শক্ত করে ধরে থাকবি

একটা বড় ঢেউতে নৌকো খুব জোরে দুলে উঠল। নিশানাথ দাঁড়িয়ে ছিলেন বলে ভারসাম্য হারিয়ে প্রায় পড়ে যাচ্ছিলেন, কোনোক্রমে সুব্রতর পিঠটা ধরে সামলালেন। তারপর বললেন, মনে রাখবি, সবসময় খুব শক্ত করে ধরে রাখতে হবে। একটু আলগা দিলেই ছিটকে ফেলে দিতে পারে। আমি ওদিক থেকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলব, সামনে বললে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়বি, আর পেছনে বললে, পেছন দিকে টানবি-কোনোক্রমে মুঠো যেন আলগা না হয়। যখন ছেড়ে দিতে হবে, তখনও আমি বলব।

নিশানাথ সুব্রতর কাঁধে হাত রেখে খুব কোমল গলায় জিজ্ঞেস করলেন, পারবি না?

সুব্রত অস্ফুটভাবে বলল, পারব।

নিশানাথ ফিরে গেলেন নিজের জায়গায়। আবার বইঠা ধরলেন এবং বহুকালের দক্ষ মাঝির মতন চালাতে লাগলেন। ফুলে উঠেছে হাত ও পিঠের পেশি। ছেলের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, এই তো ঠিক আছে, আর একটু সামনে সামনে, আর একটু–

ছই-এর মধ্যে উপুড় হয়ে শুয়ে নাসিরুদ্দিন। সুব্রতকে দেখছে আর বিড়বিড় করে বলছে পারবে না, পারবে না, লৌকোড়া কয় হাত আগুলো? কয় হাত?

বুড়ো মাঝির নিরাশা-বাক্যে সুব্রতর আরও জেদ বেড়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ আগে জলের মধ্যে যেরকম কঠিন আঙুল দিয়ে সে বাবার গলা চেপে ধরেছিল, এখন সেইরকম

আঙুলেই ধরে রইল হালটা। এক-এক সময় অসম্ভব জোর লাগছে, বড়ো বড়ো ঢেউয়ের সময় মনে হচ্ছে যেন হাত ছেড়ে বেরিয়ে যাবে, তবু সুব্রত প্রাণপণ আঁকড়ে রইল। তার গাঁটগুলো টনটন করছে। যেকোনো মুহূর্তে চামড়া ছিঁড়ে রক্ত বেরোবে মনে হয়, তবু সে ছাড়ল না।

নিশানাথ চেঁচিয়ে বললেন, ঠিক আছে, এই তো ঠিক আছে, এবার পেছনে–

তবু সুব্রতর দু-একবার ভুল হয়ে যাচ্ছে। একবার একটা বড়ো ভুলে নৌকোটা বোঁ করে ঘুরে গেল। নাসিরুদ্দিন উঠে বসে বলল, দ্যান, আমারে দ্যান, আপনার কম্মো না–

সুব্রত দাঁতে দাঁত চেপে বলল, না, আপনি শুয়ে থাকুন। আমি পারব।

নিশানাথ ছেলের ভুলের জন্য বকলেন না। বললেন, তুমি শুয়ে থাকো মাঝি, ও পারবে। দু-একবার তো ভুল হবেই–

ঝড়ের বেগ কমে এসে বৃষ্টির তোড় বেড়েছে। নিশানাথ অক্লান্তভাবে বেয়ে চললেন। এক সময় আর থাকতে না পেরে নাসিরুদ্দিন আর একখানা বইঠা নিয়ে আর একপাশে বসল। আরও প্রায় দেড় ঘণ্টা বাদে নৌকো ওপারে এসে ভিড়ল। কাছাকাছি কোনো ঘাট নেই, বাড়ি-ঘর নেই, ধু-ধু করছে মাঠ।

কাদার মধ্যে নেমে লগি পুঁতে নৌকো বাঁধলেন নিশানাথ। তারপর বললেন, এ কোথায় এলাম? জায়গাটা চেন নাকি মাঝি? নাসিরুদ্দিন বললেন, বেশি দূরে আসেন নাই। ওই দ্যাখেন না–

দূরে একটা অস্পষ্ট উঁচু স্তম্ভের মতন জিনিসের দিকে আঙুল তুলে সে বলল, ওই দেখেন না আন্দাজগড়।

নিশানাথ স্বস্তির সঙ্গে বললেন, ও তাহলে তো বারশিঙা গ্রাম খুব বেশি দূরে নয়।

–এই কোনাকুনি যেতি হবে। ক্রোশ খানেক।

–চলো, তুমিও চলো আমাদের সঙ্গে।

–আমি? আপনেরা যান, পথ চিনতে ভুল হবে না।

–পথ চেনাবার জন্য নিতে চাইছি না। তুমি এমনিই আমাদের সঙ্গে যাবে।

–তাও বুইঝলাম না।

-বুঝলে না? তুমি হঠাৎ হাল ছেড়ে দিয়ে আমাদের বিপদে ফেলেছিলে, তার ফল পেতে হবে না? এমনি এমনি ছেড়ে দেব?

–আমারে শাস্তি দেবেন? আমারে মারবেন?

হ্যাঁ, তোমাকে মারব। তোমাকে মেরে কেটেকুটে তোমার মাংস রান্না করে খাব। চলো–।

১২. শিখাদের বাড়িতে অনবরত লোকজন আসে

শিখাদের বাড়িতে অনবরত লোকজন আসে। তার বাবার কাছে আসে মক্কেলরা, কাকার কাছে অফিসের লোক, এ ছাড়া আছে দাদার বন্ধুরা। বসবার ঘরটা খালিই পাওয়া যায় না প্রায়।

দুপুরের দিকে বাবা-কাকা-দাদারা কেউই বাড়িতে থাকে না বলে শিখা সেই সময়টায় শুধু বসবার ঘরটা ব্যবহার করতে পারে। বিশেষত কলেজ বন্ধের সময়।

দেবযানী আর পলার সঙ্গে বসে গল্প করছিল শিখা, এই সময় অনিন্দ্য আর ধৃতিকান্ত এসে উপস্থিত হল। রাস্তায় জল জমে আছে, সেই জল ঠেলে এসেছে। ভিজে জুতো বাইরে খুলে রেখে ওরা ঘরে ঢুকল খালি পায়ে। অনিন্দ্য ঢুকেই বলল, আমরাও শাড়ি আর গয়না বিষয়ে অনেক কিছু জানি।

শিখা হেসে বলল, আহা, আমরা বুঝি শুধু শাড়ি আর গয়না নিয়ে আলোচনা করি?

তা হলে কী নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল?

নানান বিষয়ে।

অর্থাৎ ছেলেদের সম্পর্কে তো?

যা যা! ছেলেদের সম্পর্কে আবার আলোচনা করার কী আছে রে?

নেই বুঝি? আমরা কিন্তু ভাই ছেলেরা একসঙ্গে মিললেই কোনো-না-কোনো সময়ে মেয়েদের নিয়ে আলোচনা করবই। ফ্র্যাঙ্কলি বলছি! কী রে ধৃতি, বল না।

ধূতিকান্ত তখন পায়ের কাছে গোটানো প্যান্টটা খুলছে। দেবযানী আর পলা গম্ভীর হয়ে বসে আছে, তারমধ্যে দেবানী একটু বেশি গম্ভীর। কারণ সে অনিন্দ্যর সঙ্গে কথা বলে না।

রুমাল দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে অনিন্দ্য বলল, একটু চা-ফা হবে না? কী রে শিখা, একটু চায়ের কথা বল।

শিখা বলল, এখন সবাই ঘুমোচ্ছে। আর একটু পরে, বিকেল হোক!

তার মানে বিকেল পর্যন্ত এখানে থাকতে হবে আমাদের? বেশ তো, আমার আপত্তি নেই।

তোরা হঠাৎ এখানে এলি যে?

কী করব, ধৃতিটা যে সারাসকাল থেকে বলছে তোর সঙ্গে দেখা করতে আসবে, তোর জন্য মন কেমন করছে...

ধূতিকান্ত আপত্তি করতেই অনিন্দ্য জোরে হেসে উঠল। তারপর পলার দিকে তাকিয়ে বলল, কী রে ভালো আছিস? তোর স্বাস্থ্যটা আরও ভালো হয়েছে মনে হচ্ছে? সেই পাইলটদাদার সঙ্গে পরশু দিন আমার দেখা হয়েছিল রাস্তায়।

অকারণেই লজ্জা পেল পলা। অনিন্দ্যর ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয়, আজ আর সে অন্য কারুকে কথা বলতে দেবে না।

দেবযানীর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে অনিন্দ্য বলল, আমি এক-এক সময় কী ভাবি জানিস? মেয়েদের সম্পর্কে আড়ালে আমরা যা-যা বলি, সেগুলো তাদের সামনে এসে বললে কী ক্ষতি হয়? তেমনি মেয়েরাও বলতে পারে যা খুশি—শুধু শুধু গম্ভীরভাবে অন্য কথাবার্তা বলার কোনো মানে হয়? কী রে শিখা, তোর কোনো আপত্তি আছে?

শিখাদের বসবার ঘরটা বেশ বড়ো। এলোমেলোভাবে সাজানো। একপাশে সোফা সেট, অন্য দিকে আবার একটা ভারী কাঠের টেবিল, তার চারপাশে কয়েকটা কাঠের চেয়ার। টেবিলের ওপর কাচ পাতা, তার নীচে শিখার বাবার প্রায় দু-তিন-শো মক্কেলের কার্ড।

মেয়েরা বসেছিল সোফায়। অনিন্দ্য গিয়ে বসল, শিখার বাবার রিভলভিং চেয়ারে, তারপর টেবিলের ওপর পা তুলে দিল। তার সদ্য জলে ধোয়া ফর্সা পা। সিগারেট ধরিয়ে বলল, যেমন ধর, পাঁচটা ছেলে যদি এক জায়গায় হয়, তাদের কথাবার্তা শুনে তোদের মনে হবে পৃথিবীতে প্রেম-ভালোবাসা বলে কোনো জিনিস নেই। ওসব শিল্পী-সাহিত্যিকদের তৈরি করা গাঁজা।

ধৃতি অকারণে হেসে উঠল। শিখা তার শাড়ির আঁচল প্লেন করছে। অনিন্দ্যর সবসময় ঠোঁটে একটু হাসি লাগিয়ে রাখা কথাগুলো শুনতে মন্দ লাগে না। তবে কখন যে কোন দিকে ওর কথার মোড় ঘুরবে তা বোঝার উপায় নেই।

অনিন্দ্য বলল, ছেলেরা তখন শুধু মেয়েদের শরীর নিয়ে আলোচনা করে। কার বুক কীরকম, কার কোমরে খাঁজ আছে, কার পাছা হেভি-ঠিক যেন খাবার জিনিস, কীরকমভাবে সেটা পাওয়া যায়।

দেবযানী উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমি চলি!

অনিন্দ্য বলল, যার শুনতে ইচ্ছে হবে না, সে কানে আঙুল দিয়ে বসে থাকতে পারে। আমি কিন্তু যা ফ্যাক্ট তাই বলছি।

শিখা দেবযানীকে খানিকটা হুকুমের সুরে বলল, বোস। এখন যাবি না।

তারপর অনিন্দ্যর দিকে ফিরে বলল, তুই বুঝি ভাবছিস, তুই খুব রসিকতা করছিস? আমাদের কিন্তু শুনতে ভালো লাগছে না।

অনিন্দ্য বলল, ভালো লাগার কথা তো নয়ই। ক্রুড কথাবার্তা। কিন্তু ছেলেরা তোদের সম্পর্কে আড়ালে কী ভাবে, সেটা জেনে রাখতে ক্ষতি কী?

ধৃতি বলল, কিন্তু অনিন্দ্য, তুই সব ছেলেকে এই দলে ফেলতে পারিস না। অনেক ছেলে আছে খুব সিরিয়াস ধরনের।

যেমন তুই? তুই তো একটা মেনিমুখো।

তাহলে তুই বলতে চাস, কোনো ছেলেই ভালোবাসতে জানে না?

একা একা। একা বসে অনেক ছেলেই মেয়েদের দেবী হিসেবে পুজো করে, কিন্তু দলে ভিড়লেই এক-একটি নররাক্ষস।

এটাও সবার সম্পর্কে খাটে না।

অনিন্দ্য দারুণ কায়দায় কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, আমি কখনো অন্যরকম দেখিনি। এটা কেন হয়, তাও বলে দিচ্ছি। পিউবার্টি আসার পরেই যৌনখিদে দারুণভাবে জেগে ওঠে। মানুষের জীবনের যেটা শ্রেষ্ঠ সময়, অর্থাৎ যৌবন, সেই সময়েই, আমাদের দেশে বা সমাজে—ছেলে মেয়েরা দূরে দূরে থাকে, কেউ কারুকে পায় না। কী অসহ্য যন্ত্রণা বল তো? এটা একটা বিরাট ট্র্যাজেডি নয়?

ধৃতি গম্ভীরভাবে বলল, সংযমেরও একটা মূল্য আছে। সংযমের জন্যই পৃথিবীতে অনেক বড়ো বড়ো কাজ হয়।

অনিন্দ্য বিশ্রী শব্দ করে ব্যঙ্গের হাসি হাসল। তারপর ধৃতিকে কীটপতঙ্গের মতন জ্ঞান করে বলল, মেয়েদের সামনে সাধু সাজছিস? ন্যাকা! মেয়েরা তোর মতন ন্যাকাদের পছন্দ করে না।

শিখা তীব্র গলায় বলল, আমরা একটা দরকারি বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলাম। তোরা কেন বিরক্ত করতে এসেছিস?

আমি যা বলছি, তাও কম দরকারি নয়।

দয়া করে তোমাদের এই দরকারি কথা অন্য জায়গায় গিয়ে বলো। আমরা অন্য ব্যাপারে ব্যস্ত আছি।

শিখার পাশ থেকে পলা বলল, এইসব কথা বলার জন্য তোরা বৃষ্টি ভিজতে ভিজতে এসেছিস? তোদের লজ্জা করে না?

অনিন্দ্য পলাকে বলল, লজ্জার কী আছে রে? এসব কথা মেয়েদের কাছেই তো বলার। তাদের নিয়েই যখন সব কিছু। সবাই জানে, আমি পুরোপুরি হোমো নয়। আজ ভেবেছি তোদের কিছু জ্ঞান দেব।

আমাদের জ্ঞানের দরকার নেই। তুই এক কাজ কর, তুই এখন একটা বিয়ে করে ফেল, তাহলেই তোর সমস্যা মিটে যাবে।

অনিন্দ্য কথাটা প্রায় লুফে নিয়ে বলল, ঠিক বলেছিস। আমি বিয়ে করবই ভাবছি। কিন্তু কাকে বিয়ে করা যায়? পলা, তোকে তো পাওয়া যাবে না। তোর তো ক্যাণ্ডিডেট আছে। পাইলটদাদা তোর জন্য আগেই লাইন দিয়েছে না? শিখাও বড্ড রাগি। তুই দেবযানীকে জিজ্ঞেস কর তো, আমাকে বিয়ে করবে কিনা? জিজ্ঞেস কর না?

তুই জিজ্ঞেস করতে পারছিস না?

ও যে আমার সঙ্গে কথা বলে না। তুই জিজ্ঞেস করে দেখ। ও রাজি হলেই আমি রাজি আছি। বিয়েটা কিন্তু হিন্দুমতে হবে না। ইরানে এখনও যেরকম চালু আছে—এক রাত্তিরের জন্য কনট্র্যাক্ট ম্যারেজ।

শিখা বলল, অনিন্দ্য, তুই এবার মার খাবি কিন্তু-

দেবযানী জ্বলন্ত চোখে শিখার দিকে তাকিয়ে বলল, এইজন্যই আমি চলে যেতে চেয়েছিলাম! তবু তুই আমাকে বসিয়ে রাখলি, এইসব অপমানের কথা শোনবার জন্য?

শিখা বলল, চলে যাবি কেন? ওরা যা ইচ্ছে করলেই কী আমরা মেনে নেব? আমরা উত্তর দিতে পারি না?

এইসব ইতরের মতন কথাবার্তার উত্তর দিতেও আমার ঘেন্না করে।

পলা বলল, সত্যি, অনিন্দ্যটা দেবযানীকে দেখলেই পেছনে লাগে। এমন অপমানজনক কথা, আমাকে বললে তো আমি মার লাগাতাম।

অনিন্দ্য মুচকি হেসে বলল, কেন রে, এক রাত্রের বিয়েটা কি খারাপ?

দেবযানী আর দেরি করল না। তক্ষুনি উঠে এসে অনিন্দ্যকে এক চড় মারতে গেল। অনিন্দ্য হাত দিয়ে মুখখানা ঢেকে ফেলতেই দেবযানী তার চুলের মুঠি ধরে টানল। পলা আর শিখাও উঠে এসে দেবযানীকে সাহায্য করতে লেগে গেল, দুমদাম করে মারতে লাগল অনিন্দ্যকে। কোমল হাতের আদর নয়। রীতিমতন শক্ত হাতের শাস্তি। দেবানী অনিন্দ্যর মাথাটা দু-তিনবার জোরে ঠুকে দিল টেবিলে। ধৃতিকান্ত হাঁ করে চেয়ে রইল।

কিছুক্ষণ বাদে মেয়ে তিনটি নিবৃত্ত হওয়ার পর অনিন্দ্য আস্তে আস্তে মাথা তুলল। তার ফর্সা মুখে একটা লালচে ভাব ছড়িয়ে গেছে। চুলগুলো সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। কপালের ডান দিকে বাতাসার সাইজে ফুলে উঠেছে।

সে প্রথমেই ধৃতির দিকে ফিরে দাঁত খিচিয়ে বলল, শালা, তুই চুপ করে বসেছিলি কেন? কিছু করতে পারিসনি?

ধৃতি হাতের তালু উলটে বলল, যা বাবাঃ! আমি কী করব?

দেবযানী তখনও রাগে ফুসছে। ঘন ঘন নিশ্বাসে দুলে উঠছে তার বুক। সে বলল, আবার একটাও খারাপ কথা বললে আবার মারব।

অনিন্দ্য বলল, আমার বড় লেগেছে।

লাগুক! তাও তোমার উচিত শিক্ষা হয়নি।

এখন একটু সেবা করবে না? মেয়েরা তো দয়াময়ী হয়।

তোমার দিকে তাকাতেও আমার ঘেন্না হয়।

একটা জিনিস লক্ষ করেছ। আমি কিন্তু একবারও বাধা দিইনি। দিতে কী পারতাম না? শিভালরি জিনিসটা আমার মধ্যে এখনও আছে! আজ আমি এখানে ডিক্লেয়ার করে যাচ্ছি, মেয়েরা আমাকে যতই মারুক, আমি কোনোদিন বাধা দেব না।

তারপরই সে হো-হো করে হেসে উঠল। যেন নিজের ভেতরে সে একটা দারুণ মজায় মশগুল হয়ে আছে। কপালের ফুলো জায়গায় এমন সাবধানে হাত বুলোতে লাগল যেন কোনো ফুলকে আদর করছে। তারপর বলল, একটা সত্যি কথা বলব? মার খেতে আমার খুব ভালো লাগছিল। ব্যথা লাগছিল, সেইসঙ্গে আরামও পাচ্ছিলাম। মেসসাকিজম কাকে বলে জানিস? আমি বোধ হয় মেসসাকি। আমি আবার এইরকম আরাম পেতে চাই। সুতরাং আমি এইসব কথা আবার বলব।

সদর্পে উঠে দাঁড়িয়ে সে বলল, ধৃতি, তুই সত্যি করে বল তো, দেবযানীর ঠোঁট দুটো দেখলেই চুমু খেতে ইচ্ছে করে কি না!

দেবযানী সঙ্গে সঙ্গে মুখ নীচু করল।

অনিন্দ্য হাসতে হাসতে বলল, অত লজ্জা পাওয়ার কী আছে? কারুর ঠোঁট যদি সুন্দর হয়–

শিখা বলল, বেরিয়ে যা!

যাব না!

ধৃতি, তোমার বন্ধুকে নিয়ে যাও এখান থেকে, নইলে ভালো হবে না কিন্তু।

ধৃতি ব্যস্ত হয়ে বলল, আমি ভাই ফ্র্যাঙ্কলি বলছি, অনিন্দ্য যেরকম ব্যবহার করছে সেটা আমারও খারাপ লাগছে। এই অনিন্দ্য, কী হচ্ছে কী?

শাট আপ!

কেন ওদের শুধু শুধু রাগাচ্ছিস?

কারুকে যদি বলি তার ঠোঁট দেখলেই চুমু খেতে ইচ্ছে করে-সেটা শুনে তার রাগ করা উচিত নয়। আমি বাজি ফেলে বলতে পারি, দেবযানী রাগ করেনি। বড়োজোর লজ্জা পেয়েছে একটু।

দেবযানীর মাথার চুল উঁচু করে বাঁধা। সে এবার রাজেন্দ্রাণীর মতন ঘুরে দাঁড়ালো। স্ফুরিতাধরে বলল, আমি রাগও করিনি, লজ্জাও পাইনি। আমার ঘেন্না হচ্ছে তোমার কথা শুনে। শিখা, আমরা কতক্ষণ এ-রকম বাঁদরামি সহ্য করব?

ধৃতি বলল, অনিন্দ্য চল।

তোর ইচ্ছে হয়, তুই যা।

শিখা বলল, অনিন্দ্য, তুই এখন না গেলে তোকে জোর করে বার করে দেব।

কে জোর করছে? আমি জানি, তোর বাবা-কাকা-দাদারা কেউ এখন বাড়িতে নেই।

চাকররা আছে।

চাকর-বাকরদের দিয়ে কি অনিন্দ্য মজুমদারকে তাড়ানো যায়? লোকে কী বলবে? লোকে তো আমাকে ভালোছেলে বলেই জানে।

পড়াশুনোয় ভালো হলেই কেউ ভালো হয় না। তোর ভেতরে একটা শয়তান আছে।

অনিন্দ্য আবার হাসল অবজ্ঞা ও ব্যঙ্গ মিশিয়ে। তারপরই পাশ ফিরে খুবই সহজভাবে বলল, হোয়াট অ্যাবাউট আ কিস, দেবযানী? চমৎকার বৃষ্টির দুপুর!

দেবযানী আবার মারতে আসছিল, তাড়াতাড়ি ধৃতি মাঝখানে এসে বাধা দিয়ে বলল, আমি ওকে নিয়ে যাচ্ছি। আমি ওর হয়ে ক্ষমা চাইছি। সব কিছু নিয়েই ওর ঠাট্টা! অনিন্দ্য, যথেষ্ট হয়েছে আর না। শুধু এ-রকম অসভ্যতা ছাড়াও ছেলে-মেয়েরা একসঙ্গে মিলেমিশে অনেক কাজ করতে পারে। আমি বলছিলাম কি, এখন তো ছুটি আছে, এখন সবাই মিলে কিছু একটা কাজ করতে পারি না? আমি ভাবছিলাম, শিখার বাড়িতে কিংবা আমার বাড়িতে যদি সিটিজেনস কমিটির একটা ব্রাঞ্চ খুলি, তাহলে এই শহরের উন্নতির জন্য..!

অনিন্দ্য বলল, অর্থাৎ সেক্স রিপ্রেশানস চাপা দেওয়ার জন্য ছেলে-মেয়েদের গা ঘেঁসাঘেঁসি করে কাজ-কাজ খেলা।

ছিঃ অনিন্দ্য!

আমি ভন্ডামি একদম সহ্য করতে পারি না।

ধৃতি এবার মেজাজ গরম করে বলল, কীসের ভন্ডামি? তুই নিজেই তো একটা ভন্ড। বাড়িতে ভালো সেজে থেকে বাইরে লোককে জ্বালাতন করিস। তোর কি কোনো ভালো জিনিস সহ্য হয় না? যদি খেলার মতন করেও কিছু ভালো কাজ হয়, যদি একটা বস্তির অন্তত কুড়িটা ছেলেকেও রোজ দুধ দেওয়া যায়–

অনিন্দ্যকে অগ্রাহ্য করে পলা বলল, আমরা সেইরকমই একটা জিনিস ভাবছিলাম। আমরা ঠিক করেছি, একটা পত্রিকা বার করব। সবাই মিলে খাটব। পত্রিকা থেকে যা লাভ হবে, সেটা দিয়ে আসব মাদার টেরেসাকে।

ধৃতি উৎসাহিত হয়ে বলল, খুব ভালো কথা! যদি একটা নন-পলিটিক্যাল কাগজ বার করা যায়।

অনিন্দ্য বলল, সাহিত্য? বেকার বাঙালির একমাত্র পেশা! তার ওপর আবার মহিলা সাহিত্যিক। ওরে বাবা!

আবার অনিন্দ্যকে অগ্রাহ্য করে পলা বলল, বস্তির ছেলেদের জন্য একটা ছোটোখাটো স্কুল করার প্ল্যান দিয়েছে শিখার দাদা।

অনিন্দ্য বলল, অর্থাৎ পলা যখন অফিসারের স্ত্রী হবে, তখন যাতে বস্তি থেকে মোটামুটি ভালো চাকর পাওয়া যায়।

ধৃতি বলল, আঃ! তুই কি আমাদের কোনো কথা বলতে দিবি না।

তোরা আমার কথা শুনছিস না কেন? আমি অনেক ভালো সাবজেক্টের কথা বলছিলাম। আমি বলছিলাম চুমু খাওয়ার কথা। দেবযানী যদি রাজি থাকে।

ধৃতি অনিন্দ্যর কাঁধে হাত দিয়ে বলল, চল, এক্ষুনি বাইরে চল।

অনিন্দ্য এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ধৃতিকে এমন একটা ধাক্কা মারল যে সে আর একটু হলেই ছিটকে পড়ে যাচ্ছিল। বন্ধু হয়েও সে যে এত জোরে ধাক্কা দেবে ধৃতি সেটা অনুমানই করতে পারেনি।

ধৃতি আর কিছু বলার আগেই শিখা এগিয়ে এল অনিন্দ্যর কাছে। খুব নরমভাবে বলল, অনিন্দ্য শোন–

কী?

আমরা তোর বন্ধু হতে চাই।

আমিও-তো তাই-ই চাইছি। তবে মেয়েদের সঙ্গে বন্ধুত্ব বিছানাতেই ভালো হয়!

দু-জনে দু-জনের চোখের দিকে তাকিয়ে রইল কয়েক পলক। তারপর শান্ত গলাতেই বলল, তুই আমার বাড়িতে এসে সকলের সামনে দেবযানীকে এ-রকম কথা বলছিস কেন? কেন ওকে অপমান করছিস?

অপমান করতে চাইনি তো? দেবযানীকে কি কখনো কেউ চুমু খায়নি?

তুই জানিস না, কোনো মেয়েকে এসব কথা বলার আগে বলতে হয় তাকে ভালোবাসিস কি না?

কী করে ভালোবাসার কথা বলব? তোর বাড়িতে যদি এত ভিড় না থাকত, যদি তুই একলা থাকতিস, তাহলে নিশ্চয়ই তোকে খুব ভালো ভালো ভালোবাসার কথা শোনাতাম। দেবযানীর বাড়ি ভীষণ কনজারভেটিভ, ওদের বাড়িতে যাওয়া যায় না, কোথায় ভালোবাসার কথা শোনাব? পলা তো আউট অব বাউণ্ডস হয়ে গেছে।

যেকোনো মেয়েকে তুই ভালোবাসার কথা জানাতে পারিস?

পাচ্ছি না তো সেরকম কারুকে। তোকে কজন প্রেম জানিয়েছে? যারা তোর ওসব চান্স নিয়েছে।

আচমকা শিখা খুব জোরে একটা চড় মারল অনিন্দ্যর ডান চোখের ওপর। অনিন্দ্য দু হাতে চোখ ঢেকে ফেলল। সেই অবস্থাতেই হাসতে হাসতে বলল, এত পটপট করে তোরা গায়ে হাত তুলতে পারিস, আর ঠোঁটটা ছোঁয়াতেই যত আপত্তি? এবার কিন্তু জোর করে তোদের তিনজনকেই একসঙ্গেই–

শিখা আর একটা চড় মারল। পলা ধরল ওর কান। দেবযানী পেছন থেকে সবটা শক্তিতে একটা ধাক্কা দিয়ে ওকে ফেলে দিল মাটিতে।

ধৃতি তিক্তভাবে বলল, ঠিক হয়েছে।

তারপর স্পার্টান রমণীদের মতন ওরা তিনজন আক্রমণ চালালো অনিন্দ্যর ওপরে। দুম দুম করে ঠুকে দিতে লাগল ওর মাথা। অনিন্দ্য একটুও প্রতিরোধ করল না। নিঃশব্দে মার খেতে লাগল। শিখা ওর পিঠের ওপর বসে পড়ে হাত দুটো মুচড়ে ধরে থেকে পলাকে বলল, আলমারির মধ্যে একটা কাঁচি আছে, দে তো? ওর চুলগুলো সব কেটে দিই!

অনিন্দ্যর সৌভাগ্যবশত আলমারির মধ্যে কাঁচিটা খুঁজে পাওয়া গেল না। তার বদলে একটা পুরোনো ব্লেড পড়েছিল। পলা বলল, এইটা দিয়ে ওর একটা ভুরু কামিয়ে দিবি!

একটু দূরে দাঁড়িয়ে ধৃতি হাতের ইশারায় বলল, আর থাক!

দেবযানী দুটো কান ধরে অনিন্দ্যর মুখটা ঘুরিয়ে দিল। তারপর চটিসুদ্ধ একটা পা তার চোখের সামনে ধরে বলল, দিই, ঘসে দিই?

অনিন্দ্য নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল।

দেবযানী সত্যিই চটিটা ঘসে দিল অনিন্দ্যর ঠোঁটে। খুব জোরের সঙ্গে। এত বেশিক্ষণ সে ঘসতে চাইছিল যে পলাই তার হাত ধরে টেনে সরিয়ে আনল।

ওরা ছেড়ে দেওয়ার পর অনিন্দ্য আস্তে আস্তে উঠে বসল। একেবারে বিধ্বস্ত অবস্থা। থুথু করে মুখের ধুলো বার করতে লাগল হাতের রুমালে। তারপর শিখার দিকে তাকিয়ে বলল, একটা ভিজে তোয়ালে পাওয়া যাবে?

শিখার শরীরে তখন অনেক রাগ, তাই কথার কোনো উত্তর দিল না।

অনিন্দ্য হাতটা উঁচু করে ধৃতিকে বলল, ধর।

ধৃতি হাত ধরে তাকে টেনে তুলে বলল, আমি তোকে বারন করেছিলাম। অনিন্দ্য বলল, ছেলেরা আমার গায়ে হাত তুলতে চট করে সাহস পায় না। কিন্তু আমার এই ধরনের কিছু শাস্তি পাওনা ছিল, তাই না?

১৩. মণিকেই আজ বাজারে যেতে হবে

মণিকেই আজ বাজারে যেতে হবে। সেইজন্য সে আজ সকালে উঠেই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়া শুরু করেছে। বাজারে যেতে তার একটুও ভালো লাগে না। বাসন্তী থলিটা হাতে নিয়ে দরজার কাছে দাঁড়াতেই সে বলল, আজ ডিমসেদ্ধ দিয়ে চালিয়ে দাও-না।

ওমা, তরকারিপাতি কিছু নেই যে!

আলুওয়ালা আসবে না একটু বাদে?

তার কি কোনো ঠিক আছে? যা একটু চট করে ঘুরে আয়।

-তোমরা কি আমাকে পড়াশুনো করতে দেবে না?

-ইস, কত পড়াশুনোয় মন। এই শনিবারই তো আমরা ফিরে যাচ্ছি মুনশিগঞ্জে, তখন আবার পড়বি। ভালো দেখে চিংড়ি মাছ নিয়ে আয় তো—আমাদের ওদিকে তো তেমন ভালো পাওয়া যায় না।

মণিকে উঠতেই হল। বারান্দায় এসে চটি খুঁজছে, তখন নিভা বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। তিনি বললেন, মণি বাজারে যাচ্ছিস নাকি? দাঁড়া টাকা দিচ্ছি।

বাসন্তী বলল, আমি টাকা দিয়ে দিয়েছি মা!

তুই টাকা দিবি কেন? আমার কাছে তো বাজারের টাকা রেখে গেছেন উনি।

বাসন্তী খুব সন্তর্পণে বলল, একদিন আমি টাকা দিতে পারি না? একদিন আমার ইচ্ছে করে না তোমাকে কিছু ভালো-মন্দ খাওয়াতে!

বাবা থাকলে বাসন্তী টাকাপয়সার কথা উচ্চারণ করতেই ভয় পায়। সে নিজে থেকে কিছু জিনিস কিনলেই নিশানাথের তীক্ষ্ণদৃষ্টি তা ধরে ফেলে। তিনি রাগ করেন। মেয়ে বাপের বাড়ি বেড়াতে এসেছে। সে টাকা খরচ করবে কেন?

তা ছাড়া বাসন্তীর আরও একটা সংকোচ আছে। তার স্বামী সঞ্জয় গত কয়েক বছরে হঠাৎ অনেক টাকাকড়ি করেছে। বিয়ের সময় তার সাধারণ অবস্থা ছিল। চাকরি ছেড়ে সে এক বন্ধুর সঙ্গে পার্টনারশিপের ব্যবসায় নেমে সার্থক হয়ে উঠেছে খুব তাড়াতাড়ি। নিশানাথ ব্যাপারটা সুনজরে দেখেননি। গতবছর সঞ্জয় এসে খানিকটা বড়লোকি চাল দেখাবার চেষ্টা করেছিল বলে বিরক্ত হয়েছিলেন রীতিমতন।

বাসন্তী আর একটা ব্যাপারেও ভয় পায়। বাবাকে সে ভালোরকম চেনে। তার মনে হয় বাবা বোধহয় জামাইকে আজকাল সন্দেহ করতে শুরু করেছেন। বাসন্তীও স্বামীর ব্যবহারে বিশেষ ভরসা পায় না। সঞ্জয়কে প্রায়ই নেপালে যেতে হয়, যখন-তখন সবসময়েই একটা ব্যস্ত ভাব। সঞ্জয় যতবারই নেপাল থেকে ফেরে, মুখ-চোখের চেহারা ঠিক স্বাভাবিক থাকে না, চোখের দৃষ্টি চঞ্চল, ছেলে-মেয়েকে সেই সময় বেশি আদর করে—অনেকটা আদিখ্যেতা মনে হয়, এমনকী সে রান্নাঘরেও গিয়ে উঁকি মারে, কী কী রান্না হচ্ছে তার খোঁজ নেয়—যেন সে সংসারজীবনটাকে বেশি ভালোবেসে ফেলেছে। সঞ্জয় জামা খোলার সময় বুকপকেট থেকে খুচরো পয়সা পড়ে গেলে সেগুলো আর নিজে তোলে না। বাসন্তী বুঝতে পারে, তার স্বামী বদলে যাচ্ছে, এখন আর সঞ্জয়কে বাসন্তী ঠিক চিনতে পারে না। সঞ্জয় ব্যাঙ্কে টাকা রাখে না, আজকাল প্রায়ই বাসন্তীর জন্য সোনার গয়না উপহার আনে, আগে কখনো এসব কিনত না। বাসন্তীর ভয় হয়, বাবা যদি এসব জানতে পারেন!

বাসন্তীর বিয়ে হয়েছিল খুব অল্প বয়সে। তখন সব কিছু বোঝার মতন অবস্থা ছিল না, বাধা দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু এখন ভাবলেই কান্না পায়। বাবা তার বিয়ে দেওয়ার জন্য প্রায় সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন। মায়ের সমস্ত গয়না বিক্রি করে, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড থেকে ধার করে তার জন্য সংগ্রহ করা হয়েছিল একটি স্বামী। অনেক দেখেশুনে পাত্র নির্বাচন

করেছিলেন নিশানাথ, গরিব ঘরের ছেলে, কিন্তু পড়াশুনোয় ভালো, সচ্চরিত্র, সদ্য রেলে চাকরি পেয়েছে। এত তাড়াতাড়ি বিয়ে দেওয়ার দরকার ছিল না—কিন্তু বাসন্তী তখন ফাস্ট ইয়ারে পড়ে, কলেজের একটি ছেলের পীড়াপীড়িতে সে একদিন তার সঙ্গে পাবলিক রেস্টুরেন্টে গিয়েছিল চা খেতে। ছেলেটার নাম কমল, বড্ড আবোল-তাবোল বকত, আর সিগারেট খেত কী, একটা শেষ হতে-না-হতেই আর একটা। চা খাওয়ার পর মশলা চিবোতে চিবোতে বাসন্তী কমলের সঙ্গে বেরোচ্ছিল রেস্টুরেন্ট থেকে, এমন সময় বাবার সামনে পড়ে গিয়েছিল। যেন সামনে একটা বাঘ।

এখন বাসন্তীর নিজের গালেই চড় মারতে ইচ্ছে করে। কেন সে ওই পাগলা ছেলেটার কথা শুনে গিয়েছিল চায়ের দোকানে? বাবা-মাকে সে কিছুতেই বোঝাতে পারেনি যে মাত্র সে ওই একদিনই গিয়েছিল, আগে আর কোনোদিন যায়নি, কোনো পর্দাঘেরা ক্যাবিনেও বসেনি। কমলের সম্পর্কে তার কোনো দুর্বলতাও ছিল না, নেহাত ছেলেটা নাছোড়বান্দা, তাই ভদ্রতা করে শুধু। ওই বিচ্ছিরি ব্যাপারটা না হলে বাসন্তী আরও পড়াশুনো করতে পারত। বি এটা অন্তত পাস করলে কোনোরকম চাকরি জুটিয়ে নিজেদের সংসারে সাহায্য করতে পারত অন্তত কিছুদিন। বাসন্তীর অত তাড়াতাড়ি বিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে দাদা ঝগড়া করেছিল বাবার সঙ্গে। কিন্তু নিশানাথ দারুণ একগুঁয়ে, কারুর কথাই শুনলেন না।

বিয়ের পর স্বামীর সংসারে গিয়ে বাসন্তী খুশিই হয়েছিল। ছোট্ট সংসার, শাশুড়ি, আর একটি অল্পবয়েসি দেওর-কেউ একদিনের জন্যও একটু খারাপ ব্যবহার করেনি। আর সঞ্জয় এত ভালোবাসত যে এক-এক সময় হাঁপিয়ে উঠত বাসন্তী, তার ভয় হত, এই সুখ কী সইবে? সুখ কি বেশিদিন থাকে এক জায়গায়?

সঞ্জয়ের স্বভাবে কোনো খাদ ছিল না। সে তার সহকর্মীদের মতন তাস খেলে বেশিরাত্রে বাড়ি ফিরত না, কুৎসিত কথা উচ্চারণ করত না। দু-টি ছেলে-মেয়ে হওয়ার পর তাকে প্রায়ই টাকাপয়সার জন্য চিন্তিত দেখা যেত। ছেলে-মেয়ে দু-টিকে মানুষ করতে হবে, টাকাপয়সায় ঠিক মতন কুলোয় না। আলাদা রোজগারের জন্য কিছুদিন সন্ধ্যের দিকে

একটা কোচিং ক্লাস চালাতে শুরু করেছিল সঞ্জয়। আস্তে আস্তে জেগে উঠল তার লোভ। তাকে ছুঁয়ে দিল স্বর্ণবিষ।

বাসন্তীর জীবনে তার বাবার প্রভাবই বেশি। ছেলেবেলা থেকেই সে জানে, যেকোনো একটা শাড়ি হলেই মেয়েদের চলে যায়। নতুন একটা শাড়ি পরলে বেশ ভালো লাগে ঠিকই, বাসন্তীর খুব ভালো লাগে নতুন শাড়ির গন্ধ, কিন্তু নতুন শাড়ি না পেলেও দুঃখ করার কিছু নেই। মনে আছে, অনেকদিন আগে, তখন তাদের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল, মায়ের কঠিন অসুখের জন্য চিকিৎসাতেও অনেক টাকা লেগেছিল, সে-বছর পুজোর সময় বাবা বলেছিলেন, তিন ছেলে-মেয়ের মধ্যে মাত্র একজনকে নতুন জামা কিনে দিতে পারবেন। কে নেবে সেটা লটারি করা হোক। অতিউৎসাহে কাগজে নাম লিখে লিখে লটারি করেছিল খোকন। বাসন্তীরই নাম ওঠায় বাসন্তী খুব দুঃখিত হয়েছিল। দাদার সব কটা জামা ছেঁড়া, দাদারই একটা নতুন জামা দরকার। বাসন্তী বলেছিল, দাদা, আমি শাড়ি কিনব না, তুই বরং একটা জামা কেন। দাদা দারুণ অহংকারী, ঠোঁট উলটে বলেছিল, যা, যা!

বিয়ের আগে বাসন্তী কোনোদিন গয়না পরেনি, স্নো-পাউডার মাখেনি। সে বিশ্বাস করত, খুব ভালো করে পেঁয়াজ-পেঁয়াজ দিয়ে ধোঁকা রান্না করলে ঠিক মাংসের মতন লাগে। মাসে একদিন অন্তত দুধ না খেলে কুকুর-রুচি হয়ে যায় বলে, মাসের সেই একদিনটা ছিল কত আনন্দের। কোলাপুরি চটি ছেলে-মেয়ে সবাই পরতে পারে বলে নিজের চটি ছিঁড়ে গেলে সে ছোটো ভাইয়ের চটি পরেই রাস্তায় বেরোতে পারত। প্রথম যেদিন সে দাদাকে সিগারেট খেতে দেখে সেদিন সে আঁতকে উঠেছিল একেবারে। সিগারেট খাওয়া মানে তো টাকাপয়সা ইচ্ছে করে আগুনে পুড়িয়ে ফেলা! তার বিস্মিত মুখ দেখে তার দাদা খিচিয়ে বলেছিল, যা, যা, তুই তো বাবার আদুরে মেয়ে, এক্ষুনি নালিশ করে আয়। যা না–

এবার বাপের বাড়িতে আসবার সময় তার স্বামী তাকে পাঁচশো টাকা সঙ্গে দিয়েছে হাতখরচার জন্য। তার হাতবাক্স ভরতি গয়না, সুটকেশ ভরতি ডজন ডজন শাড়ি। কোনো

টাকাই তার খরচ হয়নি। তিনখানার বেশি শাড়ি বার করেনি। তার লজ্জা করে। সে চায় এই সংসারে কিছু সাহায্য করতে, তার ঋণ শোধ করতে। কিন্তু করবার উপায় নেই।

নিভা ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। বাজারের জন্য তিন টাকা, সব হিসেব করা।

মণি গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, কী আনব?

নিভা বললেন, যা ভালো বুঝিস, নিয়ে আয় না। একটু তরকারি, একটু মাছ–

বাসন্তী হেসে বলল, ও বাজার করার কী বোঝে? ভাগলপুরে ও কোনোদিন বাজারে যায় নাকি? তার চেয়ে বরং আমি যাই!

না, না, তোর যাওয়ার দরকার নেই। ও যা পারে আনুক, তাই দিয়ে চালিয়ে দেব। কাল তো উনিই বাজার করবেন।

বাসন্তী ভাবল, ওই তিন টাকার মধ্যে মাছ আনতে গেলে তেলাপিয়া ছাড়া আর কোনো মাছ জুটবে না। মণি ওইসব আজেবাজে মাছ একদম খেতে পারে না। বেচারা ছেলেমানুষ, বাজারে গিয়ে দিশেহারা হয়ে যাবে।

বাসন্তী মৃদুভাবে বলল, মা, আমার বুঝি তোমাকে একদিন একটু ভালো-মন্দ খাওয়াতে ইচ্ছে করে না? আমি তোমার জন্য আজ ক-টা বড়ো চিংড়ি মাছ আনব।

না, না। চিংড়ি মাছের অনেক দাম আজকাল।

তা হোক-না, একদিন তো! তুমি তো চিংড়ি খেতে খুব ভালোবাসতে। সেই মনে আছে, বড়োমামা একবার ক্যানিং থেকে গলদা চিংড়ি এনেছিলেন, কী বিরাট, জানিস মণি, পা গুলোই এত বড়ো বড়ো, মাথা ভরতি ঘি–সেবার যা হইচই হয়েছিল!

নিভা ক্লান্তভাবে হেসে বললেন, আজকাল আর আমার অত মাছ খেতে ভালো লাগে না।

হঠাৎ থেমে গিয়ে নিভা বাসন্তীর মুখের দিকে তাকালেন। কিছু একটা মনে পড়ে গেল। তিনি বললেন, তোদের মুনশিগঞ্জে ভালো চিংড়ি মাছ পাওয়া যায় না, নারে?

বাসন্তী কিছু বলবার আগেই মণি বলল, অতবড়ো চিংড়ি আমরা কখনো দেখিইনি।

বাসন্তী একেবারে শিউরে উঠল। কিন্তু আর বুঝি কিছু করার নেই। নিভা আবার ঝট করে ঘরে ঢুকে গেলেন। ফিরে এলেন আগেকার আমলের বড়োসাইজের একটা মলিন দশ টাকার নোট হাতে নিয়ে।

মণিকে বললেন, যা তো মণি, আজ ক-টা বড়ো দেখে চিংড়ি নিয়ে আয়। যত বড়ো পাবি-তরকারিপাতি বেশি আনতে হবে না।

বাসন্তী মায়ের হাতটা চেপে ধরে বলল, মা, তুমি টাকাটা রাখো। আজ আমি দিই...আমি নিজে খাওয়ার জন্য বলিনি!

নিভা বিস্মিতভাবে বললেন, তুই দিবি কেন? আমার কাছে রয়েছে তো; মণি তুই যা

মণি বেরিয়ে গেল। ধড়াম করে দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ শোনা গেল নীচে।

ওরকম যখন-তখন পয়সা খরচ করিস না। ছেলে-মেয়েরা এখনও ছটো, দুটো পয়সা যদি বাঁচাতে পারিস, তাই দেখবি। জামাইটা তো খেটে খেটে মুখে রক্ত তুলছে।

বাসন্তী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তার কান্না এসে যাচ্ছে। তার বোকামির জন্য মায়ের জমানো আরও দশটা টাকা খরচ হয়ে গেল। কেন সে চুপি চুপি আগেই মণিকে পাঠিয়ে দেয়নি। মা কী ভাবলেন, সে তার নিজের লোভানির জন্য চিংড়ি মাছের কথা তুলেছিল।

মণির তোপইতে দিবি, তখন তো আমরা ভাগলপুরে যাবই! তখন তোর যত ইচ্ছে খাওয়াবি আমাদের।

বাসন্তী মায়ের দিকে তাকাতে পারছে না। মুখ ফিরিয়ে আছে। শুধু পইতে উপলক্ষ্যে কেন, সে কি এমনিতে তার মাকে-বাবাকে-ভাইদের নিয়ে যেতে পারে না নিজের বাড়িতে? আগে সে প্রত্যেক চিঠিতে অনুরোধ করত। এখান থেকে ফেরবার সময় জোরাজুরি করত, একবার তো মাকে নিয়েও গিয়েছিল। খোকন গেছে তিন বার। কিন্তু আজকাল আর বাসন্তী নিজেই চায় না তার বাপের বাড়ির কেউ মুনশিগঞ্জে যাক।

সঞ্জয় ইদানীং মদ ধরেছে। নিজে খুব বেশি খায় না, তবে প্রতিদিনই খেতে হয় এবং ব্যাবসার বন্ধুবান্ধবদের খাওয়াতে হয়। সঞ্জয় বাসন্তীকে বুঝিয়েছে যে ব্যাবসার সুবিধের জন্য এটা করা দরকার, আজকাল প্রায় সবাই করে।

কয়েকদিনের জন্য সঞ্জয়ের মদের আসরটা বন্ধ রাখা গেলেও আরও অনেক দিকে যে সঞ্জয়ের অনেক বদল হয়েছে, তা মা ঠিকই বুঝে যাবেন। মা চুপচাপ থাকলেও সব বোঝেন। বাবার সবরকম খামখেয়ালিপনা মা মেনে নেন। এমনকী নিজের ছেলে-হারানোর দুঃখও মেনে নিয়েছেন।

বাসন্তীর বেশি রাগ হয় দাদার ওপর। দাদা যদি অত গোঁয়ারগোবিন্দ না হত, সব সময় মাথাগরম না করত, তাহলে সব কিছুই বদলে যেতে পারত। দাদাকে সবাই বলত প্রতিভাবান, পড়াশুনো কোনোদিন মন দিয়ে না করলেও সব পরীক্ষায় পাশ করে যেত টপটপ করে। দাদা জীবনে উন্নতি করতে পারত ঠিকই, কিন্তু রাগের সময় একেবারে পাগলা কুকুরের মতন হয়ে যায়, একমুহূর্তে সব বদলে ফেলে! কাপুরুষের মতন দাদাটা পালিয়েই গেল। দাদাই একমাত্র পারত মায়ের মনে শান্তি এনে দিতে। ইন্দ্রাণীর মতন মেয়ে যদি আসত এবাড়িতে তাহলে বাসন্তী দূর থেকেও নিশ্চিন্তে থাকত যে, তার বাড়ির লোকেরা স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে আছে। বাবার কোনো আশাই জীবনে ঠিকমতো মিলল না। সঞ্জয়ের সব কথা জানতে পারলে বাবা যে আরও কত দুঃখ পাবেন, সেকথা ভাবলেই বাসন্তীর বুক মুচড়ে ওঠে।

দুপুরের খাওয়াটা জমল না। মণি বারো টাকা দিয়ে তিনটে বড়ো গলদা চিংড়ি কিনে এনেছিল। কিন্তু ঘিলু পচা। ছেলেমানুষ পেয়ে তাকে ঠকিয়েছে। একমাত্র মণিই গন্ধওয়ালা মাছ মহাআহ্লাদে চেটেপুটে খেল। ঝুমাকে সেই মাছ খেতেই দিল না বাসন্তী।

খাওয়া সদ্য শেষ হয়েছে। তখনও হাত ধোওয়া হয়নি, এমন সময় দরজায় কড়া নড়ে উঠল।

দরজা খুলে দিতে গিয়ে মণি চেঁচিয়ে উঠল, বাবা এসেছে, বাবা এসেছে!

ছেলের হাত ধরে সঞ্জয় ওপরে উঠে এল। সঙ্গে একগাদা জিনিসপত্র। সঞ্জয়ের আসার কথা ছিল না। ট্রেনে তুলে দিলে বাসন্তী ছেলে-মেয়েদের নিয়ে অনায়াসে চলে যেতে পারে।

সঞ্জয় হাসিমুখে বলল, হঠাৎ চলে এলাম, তোমাদের নিয়ে যেতে। ঝুমা কোথায়? ঝুমাকে দেখছি না।

নিজের স্বামীকে প্রায় একমাস পরে দেখেও খুশি হতে পারল না বাসন্তী।

এই একমাসে আরও অনেকটা যেন বদলে গেছে সঞ্জয়। মুখ-চোখে একটা ধূর্তের ভাব ফুটে উঠেছে। বোধ হয় এরমধ্যে আরও অনেক টাকা রোজগার করেছে।

বাসন্তীর বুক থেকে একটা ভয়ের দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

১৪. মণীশকে দেখে ভাস্কর সত্যিকারের অবাক

মণীশকে দেখে ভাস্কর সত্যিকারের অবাক হয়ে গেল। তাকে ভেতরে ডাকতে ভুলে গিয়ে বলল, তুই?

মণীশ বলল, হ্যাঁ চলে এলাম। তুই কোথাও বেরোচ্ছিস নাকি?

সকাল ন-টা, ভাস্কর তখন অফিসে বেরোবার জন্য তৈরি হচ্ছিল। বলল, একটু পরে যাব, আয়।

ভেতরে ঢুকে পরপর ঘরগুলো বন্ধ দেখে মণীশ জিজ্ঞেস করল, বাড়িতে কেউ নেই নাকি? মাসিমা-মেলোমশাই কোথায়?

ওঁরা পুরীতে বেড়াতে গেছেন।

মণীশ প্রফুল্লভাবে বলল, যাক। ভেবেছিলাম হয়তো শুনব, দু-জনেই টেসে গেছেন। বয়েস হয়েছে তো!

ভাস্কর একটু হাসল। মণীশের বরাবরই এ-রকম চমকানো কথা বলার অভ্যেস।

–একা আছিস? বিয়ে করিসনি?

–না! তুই তো শিলং-এ ছিলি এতদিন। আমি খবর পেয়েছিলাম।

–পাবি না কেন? গোপন তো কিছু নয়। আমি শিলং-এ-ই সেটল করব ভাবছি। ভাস্করকে কিছু বলতে হল না, মণীশ নিজেই চলে এল ভাস্করের নিজস্ব ঘরে। নীচু খাটটার ওপর

ধপাস করে বসে লম্বা ঠ্যাং দুটো ছড়িয়ে দিল। তারপর এদিক-ওদিক দেখতে লাগল অনেকক্ষণ ধরে। নাকটা কুঁচকে আছে।

কী দেখছিস?

দেখছি, পুরোনোকালের গন্ধ পাওয়া যায় কি না।

-তুই মাত্র তিন বছর ছিলি-না এখানে।

-আমার কাছে এই তিন বছরটাই অনেক লম্বা। চা বানাবারও লোক নেই?

-সকাল বেলা ঠিকে ঝি আমার চা বানিয়ে দিয়ে গেছে। তুই চা খাবি? আমি বানিয়ে দিচ্ছি।

তুই এ-রকম একা আছিস জানলে তোর এখানেই এসে উঠতাম। তোর এই খাটটাতে তো আমি অনেকদিন শুয়েছি।

ভাস্কর একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, তুই কোথায় উঠেছিস তাহলে?

হোটেলে। কাল রাত্রে এসে পৌঁছেচি। আগে থেকে বুক করা ছিল না, ভালো হোটেলগুলোতে জায়গাই পাওয়া যায় না।

বাড়িতে যাসনি এখনও?

না, বাড়িতে কেন যাব? বাড়ির সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক?

একটু থেমে থেকে ভাস্কর বলল, আমি ভাবলাম, এতদিন পরে রিটার্ন অব দা প্রডিগাল সান।

বাড়ি-ফাড়ি আর কিছু নেই আমার জীবনে। কলকাতা শহরটাকে ভালোবাসি, বেশিদিন ছেড়ে থাকলে মন কেমন করে, তাই বেড়াতে এলাম একবার-

মণীশ, তুই এখনও হাই-স্ট্রং হয়ে আছিস।

আমি তো বরাবরই এইরকম।

বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে বরাবরের জন্য কেউ বাইরে চলে যায়? তোর মা ভাই-বোনদের সঙ্গেও দেখা করতে ইচ্ছে করে না?

খুব সংক্ষেপে না বলে মণীশ সিগারেট ধরালো। ভাস্করের ছবিগুলোর দিকে চোখ বোলালো খানিকক্ষণ। তারপর বলল, তোর ইচ্ছে করে না, তোর ভাই-বোনদের সঙ্গে দেখা করতে?

আমার আবার ভাই-বোন কোথায়?

তাহলে? তোর ভাই-বোন নেই, আমারও না-থাকতে পারত। কিংবা মরে যেতে পারত। মোটকথা, ওদের কথা আর আমার মনে পড়ে না।

আমি বিশ্বাস করি না তোর কথা। কোনো মানুষই তার মাকে অন্তত ভুলতে পারে না।

—আমি বিশ্বাস করতে চাই, আমি আমার জন্মের জন্য কারুর কাছে ঋণী নই, কোথাও আমার কোনো বন্ধন নেই, আমি স্বাধীন, আমি নিজের ইচ্ছেমতন বাঁচব কিংবা মরব।

এটা স্বার্থপরের মতন কথা।

হতে পারে। আমি সত্যিই স্বার্থপর। কোনো বাবা-মা-ই পরিকল্পনা করে কোনো সন্তানকে পৃথিবীতে আনে না। তারা এসে যায়। আমি পঙ্গু হতে পারতাম, অন্ধ হতে পারতাম, অল্প বয়েসে মরে যেতে পারতাম।

তুই সুস্থ শরীরে বেঁচে আছিস।

ঠিক তাই। আঠাশ বছর বাপ-মায়ের সঙ্গে কাটিয়েছি। তাদের স্নেহ দেখাবার কিংবা শাসন করবার সুযোগ দিয়েছি। তাই কি যথেষ্ট নয়?

ভাস্কর আরও কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল। মুখে ফুটে উঠল সামান্য বিরক্তির ছায়া। মণীশ তার মুখের দিকে খরচোখে চেয়ে আছে।

আর কিছু বলবি না?

আমি তোর সঙ্গে তর্ক করতে যাচ্ছিলাম। বোকার মতন তোকে উপদেশ দিচ্ছিলাম। কিন্তু তোর যা-ইচ্ছে তাই করবি, তাতে আমার কী আসে যায়? শুধু এইটুকু বলতে পারি, তুই কোনোদিন সুখ পাবি না।

সুখ চাহি নাই মহারাজ, জয় চেয়েছিনু...।

শিলং-এ কী করছিস, ব্যাবসা?

হ্যাঁ। প্রথম কিছুদিন ভ্যাগাবণ্ডের মতন ঘুরেছি। তারপর গৌহাটিতে একজন ট্যাক্সি ড্রাইভারের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। তার পাশে বসে থেকে অ্যাসিস্ট্যান্টগিরি করতাম। তারপর ড্রাইভিং শিখে নিয়ে ট্যাক্সি চালাতে শুরু করলাম। এখন আমার নিজেরই দু-খানা ট্যাক্সি, তা ছাড়া অর্ডার সাপ্লাই শুরু করেছি।

এরপর বাকিজীবনটা শিলং-এর অর্ডার সাপ্লায়ার হয়ে কাটিয়ে দিবি?

উঁহু। বিজনেস আর একটু বাড়লে কলকাতাতেও অফিস খুলব।

তারপর দিল্লিতে অফিস খুলবি। মুম্বইতে অফিস খুলবি। বিরাট একটা শিল্পপতি হয়ে যাবি, তাই না?

সাউণ্ডস রিডিকুলাস? হিন্দি সিনেমা?

মণীশ নিজেই হেসে উঠল। সে বেশ উপভোগ করছে ব্যাপারটা। জুতোসুদ্ধ পা মাটিতে ঠুকতে ঠুকতে বলল, আমাদের ভারতীয় দর্শনটাই হল ত্যাগের। এটা একেবারে মজ্জায় মজ্জায় মিশে আছে। কেউ যদি হঠাৎ বেশ টাকাপয়সা রোজগার করতে শুরু করেন, অবস্থাপন্ন হয়ে যান–ব্যাপারটা অন্য কারুর পছন্দ হয় না। ঠিক হিংসে নয়, অন্যরা ব্যাপারটা ভালগার মনে করে। মনে করে যে লোকটা আর খাঁটি নেই। আপনি আপনি বড়োলোক হয়ে যাওয়াটা সবাই পছন্দ করে–লটারির টিকিট কিংবা গুপ্তধন পেয়ে–কিন্তু চেষ্টা করে বড়োলোক হওয়াটা কেউ পছন্দ করে না।

তুই তাহলে বড়োলোক হয়েছিস? হতে চলেছি।

হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলে মণীশ বলল, কী আজেবাজে ছবি এঁকেছিস? তোর আঁকার হাত খুব খারাপ হয়ে গেছে।

ভাস্কর আহত বোধ করল। মণীশের স্বভাবটা কাঁকড়াবিছের মতন। কাছাকাছি কেউ থাকলে দংশন করবেই। ভাস্করের অভ্যেস আছে, কিন্তু আর সব কিছু সহ্য করলেও ছবির নিন্দে তার গায়ে লাগে। খানিকটা শ্লেষের সঙ্গে বলল, তুই আবার ছবির বোদ্ধা হলি কবে থেকে?

মণীশ হাসতে হাসতে উত্তর দিল, বড়োলোকরাই তো ছবির সমঝদার হয়। এদেশের শিল্পীরা কখনো গরিবদের জন্য ছবি আঁকে?

ভাস্কর উঠে দাঁড়িয়ে ঘড়ি দেখল।

আমাকে তো এবার অফিসে যেতেই হবে।

মণীশ তার হাত ধরে টেনে বলল, আরে বোস।

ভাস্কর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, আমি তোকে চা করে দিচ্ছি। তারপর তুই এখানেই থেকে যেতে পারিস।

বোস না। তোর সঙ্গে গল্প করতেই তো এলাম।

আমি অফিসে গিয়ে ইন্দ্রাণীকে ফোন করে দিচ্ছি। ও যদি চলে আসতে পারে।

মণীশ গম্ভীরভাবে বলল, আমি ইন্দ্রাণীর সঙ্গে দেখা করতে চাই না।

ভয় পাচ্ছিস?

আমি মেয়েছেলে-ফেয়েছেলেদের একদম সহ্য করতে পারি না।

ইন্দ্রাণী মেয়েছেলে নয়। শুধু মেয়ে।

আমার ল্যাঙ্গুয়েজে তোর আপত্তি?

তুই অনেক বদলে গেছিস, মণীশ। স্বা

ভাবিক।

তুই হঠাৎ কলকাতায় এলি কেন?

তোদের জ্বালাতে।

ইন্দ্রাণীকেও?

তোকে তো বললাম, মেয়েদের সম্পর্কে আর আমার কোনো আগ্রহ নেই, ইন্দ্রাণী সম্পর্কেও না।

তোর আসল অভিমানটা কার ওপর? তোর বাবার ওপরে, না ইন্দ্রাণীর ওপরে?

অভিমান? অভিমান তো মেয়েদের হয়। পুরুষমানুষের আবার অভিমান কী? অবশ্য সংস্কৃতে অভিমান মানে অহংকার, সেটা যদি বলিস তো তা আমার নিশ্চয়ই আছে।

কেন লুকোচ্ছিস? আমার কাছে তুই সব কথা খুলে বলতে পারিস না?

বলবার কিছু নেই। আমার বাবার সঙ্গে আমার মতে মিলত না, প্রায়ই ঝগড়া হত, একদিন আমার গায়ে হাত তুলেও ছিলেন, তাই আমি বাড়ি ছেড়ে চলে গেছি। ইন্দ্রাণী সম্পর্কে একসময় আমার দুর্বলতা ছিল, ছেলেমানুষি ব্যাপার, সেটা এখন কেটে গেছে। ব্যাস, এই তো!

না, এ-ই সব নয়। আসলে তুই ভীষণ চাপা। নিজেকে কিছুতেই খুলে ধরতে পারিস না।

খুলে ধরার কী আছে? আমার বাবার সঙ্গে আমার বিরোধটা আদর্শগত। উনি চান সভাবে গরিব হয়ে থাকতে। আমার কাছে সেটা মনে হয় বোকামি। আর সব শুয়োরের বাচ্চারা যে যা পারছে লুটে নিচ্ছে আর আমি সততার নাম করে আঁটি চুষব?

বুঝলাম। এটা তো গেল তোর বাবা সম্বন্ধে। আর ইন্দ্রাণী সম্পর্কে হঠাৎ মন বদলালি কেন?

বিয়ার খাওয়াবি? কাছাকাছি দোকান নেই?

এই সকাল বেলা বিয়ার?

সন্ধ্যে হলে হুইস্কি খেতে চাইতাম।

এসব বুঝি শিলং-এর অভ্যেস?

হ্যাঁ। তা ছাড়া উঠতি বড়োলোক, সাপ্লাইয়ের ব্যাবসা, তার সঙ্গে এটা খুব মানিয়ে যায় না?

তারা নানা ধরনের মেয়ে নিয়ে ফুর্তিও–

ওটা শুধু আমার চলে না।

আমারও অফিসের দিন সকাল বেলা বিয়ার চলে না।

ভাস্কর, আমার কলকাতায় এত বন্ধুবান্ধব ছিল, আমি শুধু তোর কাছেই এসেছি।

তোকে একটা কথা বলব মণীশ? তুই ইন্দ্রাণীকে ভুল বুঝেছিস। তুই আমাকেও ভুল বুঝেছিলি।

কিছুই ভুল বুঝিনি।

ইন্দ্রাণী আমার বোন। ওকে আমি খুব ভালোবাসি ঠিকই কিন্তু সেটা স্নেহেরই আর একটা নাম। এই আমি আমার ছবি ছুঁয়ে বলছি, কিংবা তুই যেকোনো প্রতিজ্ঞা করতে বল, ইন্দ্রাণী সম্পর্কে আমি অন্য কিছু কক্ষনো ভাবিনি।

এক টুকরো মাংস নিয়ে দু-টো কুকুর ঝগড়া করে। আমি কুকুর হলে তোর সঙ্গে ইন্দ্রাণীকে নিয়ে ঝগড়া করতাম।

তুই ওরকমভাবে বলিস না। প্লিজ মণীশ, আমি আন্তরিকভাবে বলছি, তুই ইন্দ্রাণীকে সেই সময়ে বিয়ে করলে আমি সত্যিই খুশি হতাম। এমনকী এখনও।

ব্লাডি ফুল।

মণীশ–

নে চল ওঠ, তুই অফিসে যাবিই যখন, আমিও বেরোই তোর সঙ্গে।

না, তুই থাক। আমি ইন্দ্রাণীকে খবর দিচ্ছি।

খবর পেলেই সে ছুটে আসবে? আলুথালুভাবে? বিরহিণী রাধিকা? কেন, এর মধ্যে সে আর কারুর সঙ্গে প্রেম করতে পারেনি?

ইন্দ্রাণী আর কারুর সঙ্গে মেশে না।

কেন মেশে না? চেহারাটা তো মন্দ নয়, অনেক ছেলের কাছেই অ্যাটট্র্যাকটিভ মনে হবে।

তুই একসময় তো ওকে ভালোবাসতিস। তুই ওর সম্পর্কে এ-রকমভাবে কথা বলতে পারিস।

খারাপ কী বলেছি?

ও এখনও তোকে মনে রেখেছে।

সো হোয়াট? শি ডিজার্ভস আ গুড হাজব্যাণ্ড। অনেকটা তোর মতন কেউ যদি

তুই তো ওর নেচার জানিস। খুব বেশি বাড়ি থেকে বেরোনো কিংবা কোথাও গিয়ে হইচই করা—এসব ঠিক ওর ধাতে নেই। তাহলে আর অন্য কারুর সঙ্গে ওর আলাপ হবে কী করে?

জানি। ও যদি এখনও পর্যন্ত আর কারুর সঙ্গে প্রেম না করে থাকে, তবে তার কারণ আমি নই। তার কারণ তুই।

মণীশ, বিশ্বাস কর, নিজের বুকে হাত দিয়ে বলছি।

শাট আপ! আমি বোকা নই!

১৫. জীবন ডাক্তার ওই তিনজনের চেহারা দেখে

জীবন ডাক্তার ওই তিনজনের চেহারা দেখে একেবারে হইহই করে উঠলেন।

নিশানাথ বললেন, খিচুড়ি চাপাও তাড়াতাড়ি। খুব খিদে পেয়েছে।

নিজে বারান্দায় বসে পড়ে তিনি সুব্রত ও নাসিরুদ্দিনকেও বললেন, বোসো!

জীবন ডাক্তার বললেন, বসবে কী? শিগগির জামাকাপড় ছেড়ে নাও। তোমাকেও বলিহারি নিশি, এই বৃষ্টিবাদলার মধ্যে কেউ নদী পার হয়? কতক্ষণ ধরে গায়ে জল বসেছে। চেহারা হয়েছে সব ঝড়ে-পড়া গাছের মতন। কোনো বিপদ-আপদ হয়নি তো?

নাসিরুদ্দিন ও নিশানাথ দু-জনেই একবার আড়চোখে তাকালেন সুব্রতর দিকে। নিশানাথ বললেন, না, সেরকম কিছু হয়নি।

তোমার জামায় রক্ত কেন? থুতনির কাছে কেটেছে।

ও কিছু নয়, আছাড় খেয়ে পড়ে গিয়েছিলাম।

জীবন ডাক্তারের বোনও বেরিয়ে এসেছে ঘর থেকে। ডাক্তার তাকে বললেন, গোটা তিনেক ধুতি বার করে দে তো উমা।

তিনখানা ধুতি কাচা নেই বাড়িতে। দু-খানা জোগাড় হল। উমা আর একটা সরু কালো পাড়ের শাড়ি নিয়ে এসে নিশানাথকে বলল, আপনি এটা পরুন। ওরা দু-জনে ধুতি পরুক।

নাসিরুদ্দিন আড়ষ্ট হয়ে গেছে। সে আপত্তি করে বলল, তার ধুতির দরকার নেই, ভিজে লুঙি পরে থাকা তার অভ্যেস আছে। কিন্তু তার আপত্তি কেউ গ্রাহ্য করল না। বাথরুমে গিয়ে সবাইকে শুকনো কাপড় পরে আসত হল।

জীবন ডাক্তারের বাড়িখানা প্রায় মাঠের মধ্যে। বাড়িখানার কোনো শ্রীছাঁদ নেই, নিছক ইট সিমেন্টে গাঁথা কয়েকটি দেওয়াল ও ছাদ। লম্বা টানা বারান্দা, একটি হলঘর, দু-টি শোওয়ার ঘর, একটু দূরে বাথরুম, রান্নাঘর। উঠোনের মধ্যে বাঁশ ও টালি দিয়ে আরও কয়েকখানা ঘর বানানো হয়েছে এলোমেলোভাবে। জীবন ডাক্তার তাঁর স্ত্রী, বোন উমা আরও ছ-সাতজন মানুষ থাকে এখানে। স্থানীয় লোক এই বাড়িটার নাম দিয়েছে জীবন ডাক্তারের হাসপাতাল।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে নিশানাথ নাসিরুদ্দিনকে দেখিয়ে বললেন, ওকে একটু পরীক্ষা করে দেখো তো ডাক্তার এর ফিটের ব্যারাম আছে কি না।

জীবন ডাক্তার হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলেন, কেন, কী হয়েছে?

ও হল নৌকোর মাঝি, অথচ আমাদের দিয়েই নৌকো বাইয়েছে। বুঝে দেখো ব্যাপার!

নাসিরুদ্দিন চুপ করে রইল।

জীবন ডাক্তার তার দু-চোখের তলার দিকটা একটু টেনে ধরে বললেন, ফিটের ব্যারাম আছে কি না জানি না। কিন্তু এর তো সাংঘাতিক অ্যানিমিয়া। শরীরে কিছুই নেই। বয়েস কত হল?

তিন কুড়ি আট।

নিশানাথ চমকে উঠে বললেন, আটষট্টি? আমি ভেবেছিলাম, ছাপ্পান্ন-সাতান্ন হবে।

জীবন ডাক্তার বললেন, এই বয়েসেও নৌকো চালিয়ে যাচ্ছ। শেখের পো, এবার মাঝিগিরি থেকে ছুটি নাও। বিশ্রাম নাও এবার।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম দার্শনিকের মতন নিরাসক্ত গলায় নাসিরুদ্দিন উত্তর দিল, পেটের ভাত জোগাবে কে?

একটু থমকে গেল বাকি দু-জন। জীবন ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন, কেন, ছেলেপুলে নেই?

নাসিরুদ্দিন মাথা নাড়ল দু-দিকে।

জীবন ডাক্তার বললেন, এর দেখছি আমারই মতন অবস্থা।

ওর আবার বউও নেই। আছে শুধু একটা নৌকো।

একটু চিকিৎসা না করলে, খাওয়া-দাওয়া ঠিকমতন না করলে ও নৌকোর ওপরেই একদিন মুখ থুবড়ে মরবে। শোনো মিয়া, আমার এখানেই কিছুদিন থাকো।

নিশানাথ বললেন, তোমার এখানে আশ্রিতের সংখ্যা আরও বাড়বে। আমার ছোটো ছেলেটাকে নিয়ে এসেছি, এবার দেখে যাক, তারপর আমার ইচ্ছে ওকে এখানে কিছুদিনের জন্য রাখব।

জীবন ডাক্তার সুব্রতর দিকে তাকালেন। বারান্দায় উমার পেতে দেওয়া মাদুরে সুব্রত গা এলিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। এতক্ষণের ক্লান্তি আর মানসিক চাপ সে আর সহ্য করতে পারছে না। একটু দূর থেকে তার ঘুমন্ত মুখখানা অসহায়ের মতন দেখায়।

জীবন ডাক্তার বললেন, ও তো একেবারেই ছেলেমানুষ। ও এখানে কী করবে?

থাকুক। কিছুদিন খাটুক-পিটুক; জীবনটাকে দেখুক। অভিজ্ঞতা বলতে তো কিছুই হল না। এবার পরীক্ষাও দিতে পারেনি।

তোমার বড়োছেলের খোঁজখবর পেয়েছ?

হ্যাঁ, সে শিলং-এ কাজ করে।

রান্নাঘরে জীবন ডাক্তারের স্ত্রী সাবিত্রী ততক্ষণে খিচুড়ি চাপিয়ে দিয়েছেন। নিশানাথ হেঁটে এসে রান্নাঘরের দরজার কাছে দাঁড়ালেন। উমা তাকে দেখে বললেন, কী, খুব খিদে পেয়েছে বুঝি?

নাড়িভুঁড়ি হজম হয়ে যাওয়ার উপক্রম। বউদি, বেশি করে বানাবেন কিন্তু–

সাবিত্রী বললেন, আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই হয়ে যাবে। উমা একটা সিঁড়ি পেতে দে না! বসুন, এখানেই বসুন।

না, থাক, আপনাকে একটু দেখতে এলাম। শরীর ভালো আছে?

হ্যাঁ।

উমা বলল, নিশিদা, আপনাকে শাড়ি পরে বেশ দেখাচ্ছে কিন্তু আপনার রং তো ফর্সা, আপনার নিশি নাম কে রেখেছিল?

নিশানাথ হেসে বললেন, অনেকেই এই ভুল করে। নিশানাথ কথাটার মানে হচ্ছে চাঁদ। অবশ্য আমার সঙ্গে মানায় না।

আপনার নাম মহাদেব রাখা উচিত ছিল!

উমার বয়েস চল্লিশের কাছাকাছি, লম্বা ধাঁচের শরীর, এখনও খানিকটা বালিকার মতো চাঞ্চল্য আছে। বছর দশেক আগে নিঃসন্তান অবস্থায় বিধবা হয়েছে, সেই থেকে জীবন ডাক্তারের আশ্রয়ে। উমা দারুণ খাটতে পারে। রাত্তির বেলা এবাড়ির শেষ আলোটি সে-ই নেভায়, আবার জেগে ওঠে খুব ভোরে। তার অতিরিক্ত প্রাণশক্তি সবসময় একটা কিছু অবলম্বন খোঁজে।

জানো বউদি, আজ নিশিদা আর ওনার ছেলে জলে পড়ে গিয়েছিলেন।

সাবিত্রী শিউরে উঠে বললেন, ওমা, সে কী? এই ভরাগঙ্গায়? তারপর কী হল?

নিশানাথ একটু হেসে বললেন, এত ভয়ের কী আছে? আমি একসময় ভরাপদ্মাতেও সাঁতার কাটতাম।

সাবিত্রী বললেন, সেসব দিনের কথা আর এখনকার কথা কি এক? সাবিত্রীর জীবনে সময় অনেক বদলে গেছে সত্যিই। মাত্র বারো-তেরো বছর আগেও তিনি এলাহাবাদের একটি বড়ো বাড়ির অতি সুসজ্জিত ড্রয়িংরুমে বসে অতিথিদের আপ্যায়ন করতেন। বাবুর্চি-বেয়ারারা চা জলখাবার এনে দিত ট্রে সাজিয়ে। মাঝদুপুরে পারতেন না। অথচ এখনও স্বচ্ছন্দে করে যাচ্ছেন। মানুষের জীবন সব কিছুই মানিয়ে নিতে পারে।

বেশ কয়েক ঘণ্টা ঝড়-বৃষ্টির পর এখন হালকা করে রোদ উঠেছে। আকাশে দেখা যাচ্ছে কয়েকটা চিল। তারা এখন ক্রমশ উঁচু থেকে আরও অনেক উঁচুতে উঠে যাবে। এইমাত্র তাদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল একটা চকচকে রুপোলি বিমান।

উমা বলল, পরশুদিন নাজির শেখের গোরুর গাড়ির চাকা কাদায় আটকে গেল, কিছুতেই আর টানাটানি করে তোলা যায় না। আমি ভাবলাম, নিশিদা থাকলে, ঠিক একাই তুলে দিত।

নিশানাথ বললেন, ওইসব সময়ে বুঝি আমার কথা মনে পড়ে?

উমা হাসতে হাসতে বলল, না, আপনার কথা সবসময়েই মনে পড়ে।

সাবিত্রী বললেন, আপনাকে কত কষ্ট করে এতদূরে আসতে হয়।

আমিও তাই তো ভাবি, যদি এখানেই থেকে যেতে পারতাম।

উমা বলল, এ কী নিশিদা, আপনার থুতনি দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে যে!

নিশানাথ তাড়াতাড়ি সেখানে হাত চাপা দিয়ে বললেন, কই? না তো! একটু আগে ধুয়ে ফেললাম যে!

দেখি, দেখি, হাতটা সরান তো! ইস, এ যে গর্ত হয়ে গেছে! কী করে লাগল?

উমা দৌড়ে চলে গেল বাইরে। তক্ষুনি নিয়ে এল ডেটল, তুলো, স্টিকিং প্লাস্টার। হুকুমের সুরে বলল, মুখটা তুলুন!

নিশানাথ থুতনি উঁচু করে বাধ্যছেলের মতন চুপ করে বসে রইলেন। উমা সামনে হাঁটু গেড়ে নিপুণহাতে একটা ছোট্ট ব্যাণ্ডেজ করে দিল। তারপর মৃদু ভর্ৎসনার সুরে বলল, আপনি কি বাচ্চাদের মতন এখনও হুটোপুটি করতে যান নাকি? নিজের কথা একদম ভাবেন না কেন? অন্তত আমাদের কথা ভেবেও তো নিজের একটু যত্ন নিতে পারেন!

নিশানাথ মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন।

খিচুড়ি রান্না হয়ে গেছে। পাত পেতে দেওয়া হল বারান্দায়। নাসিরুদ্দিন দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে ঝিম মেরেছিল, তাকে বসানো হল, ডেকে তোলা হল সুব্রতকে।

গরম গরম খিচুড়ি, একটু ঘি আর ডিম ভাজা। তাও সুব্রতর মুখে রুচি নেই। হাত উঠতে চাইছে না। অসম্ভব ক্লান্ত, ইচ্ছে করছে খাবারের থালার পাশেই আবার শুয়ে পড়তে।

উমা এসে বলল, এ কী খোকন, খাচ্ছ না যে। খাও, আর একটু খিচুড়ি দিই?

সুব্রতর নিষেধ সত্ত্বেও উমা আর এক হাতা গরম খিচুড়ি ঢেলে দিল তার পাতে। সুব্রত বিরক্ত হয়ে উঠল। এসব বাড়াবাড়ি তার ভালো লাগে না।

নাসিরুদ্দিন খাচ্ছে ফেলে ছড়িয়ে। মনে হয়, খিদে থাকলেও খিচুড়ি জিনিসটা তার পছন্দ নয় ঠিক। আর একটি ডিমভাজা নিতে সে আপত্তি করল না।

নিশানাথ বললেন, বউদি, আপনার রান্না খুব স্বাদের হয়েছে।

উমা বলল, ওকী নিশিদা, আপনি কতগুলো কাঁচালঙ্কা খাচ্ছেন?

নিশানাথ মুচকি হেসে বলল, আরও কয়েকটা লাগবে বোধ হয়?

দাঁড়ান, এনে দিচ্ছি বাগান থেকে। দেখি আপনি কত ঝাল খেতে পারেন!

বাজি ফেলবে নাকি?

থাক বাবা! বাজি ফেলে দরকার নেই। আপনি সব পারেন। আর একটু খিচুড়ি দিই?

কী দিয়ে খিচুড়ি খাব? লঙ্কা ফুরিয়ে গেল যে!

সুব্রত অবাক হয়ে বাবার দিকে চেয়ে রইল। তার বাবাকে এ-রকম হালকাভাবে কথা বলতে সে কখনো শোনেনি। বাড়িতে কোনো রান্নার ভালো মন্দ সম্পর্কে বাবা মন্তব্য করেন না। এখানে সে বাবাকে অন্যরকম দেখছে।

হঠাৎ তার মনে পড়ল, বাবা ইচ্ছে করে নদীর মধ্যে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। যদি সে ডুবে যেত। ভাবতেই শরীরটা ঝিমঝিম করে ওঠে। দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার কী অসহ্য কষ্ট। রাগে তার শরীর জ্বালা করে, ইচ্ছে করে এক্ষুনি একটা কিছু প্রতিশোধ নেওয়ার।

খাওয়া শেষ হওয়ার পর হাত ধুয়ে এসে নাসিরুদ্দিন বলল, বাবু, এইবার তাহলে আমি যাই।

নিশানাথ এক ধমক দিয়ে বললেন, কোথায় যাবে তুমি? এখানেই শুয়ে থাকো!

ঘরে যেতি হবে না?

কে আছে তোমার ঘরে। কেউ তো নেই বললে! এত তাড়া কীসের?

নৌকোডা একলা একলা রয়েছে।

নৌকো কি কাঁদবে নাকি তোমার জন্য? নৌকো চুরি যাবে না, সেটার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তুমি এখানে থাকবে। তোমার চিকিৎসা করা হবে। এই ডাক্তারবাবু সুঁই দিয়ে দিয়ে তোমার শরীরে গর্ত করে দেবে। তাহলে বাঁচবে তুমি, বুঝলে?

নাসিরুদ্দিন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। জীবন ডাক্তার বলল, বুড়ো মাঝি, আর ক-টা দিন বাঁচতে চাও, না চাও না? তাহলে একটু ওষুধপত্তর খেতে হবে।

শুধু ওষুধ খেলি তো চলবে না। প্যাডে খাব কি?

এখানে থাকো। আমরা যা খাই, তাই খাবে।

আমাকে একবার ঘরে যেতি হবে।

নিশানাথ কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, জীবন ডাক্তার তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, জোর করে কারুর চিকিৎসা করা যায় না। তাতে ফল হয় না তেমন।

জীবন ডাক্তার ঘর থেকে এক পাতা ওষুধ এনে বললেন, যাও মাঝি, ঘুরে এসো। পারলে আবার এসো। এরমধ্যে যে বড়ি আছে, রোজ এবেলা-ওবেলা একটা করে খাবে। যদি শরীরটা একটু ভালো লাগে তাহলে আবার এসো। কোনো ভয় নেই, যখন ইচ্ছে হয় তখনই আসবে। না, না, ধুতি ছাড়তে হবে না। ওটা তুমি নিয়ে যাও।

নাসিরুদ্দিন আর বাক্যব্যয় করল না। ওষুধের পাতাটা ট্যাঁকে খুঁজে ভিজে জামা কাঁধের ওপর ঝুলিয়ে রওনা দিল।

উমা সুব্রতকে যত্ন করে ঘরের মধ্যে বিছানা পেতে শুইয়ে দিয়েছে। জীবন ডাক্তার নিশানাথকে বললেন, তুমিও একটু বিশ্রাম নিয়ে নাও?

নিশানাথ বললেন, আমার বিশ্রাম হয়ে গেছে। চলো, বেগুন খেতটা দেখে আসি। ফুল এসেছে?

দু-জনে বাড়ির পেছন দিকে চললেন। দূরে বুড়ো নাসিরুদ্দিনকে তখনও দেখা যায়। মাঠের মধ্য দিয়ে এবড়োখেবড়োভাবে হাঁটছে। সেদিকে তাকিয়ে নিশানাথ জিজ্ঞেস করলেন, কী মনে হয়, লোকটা আর ফিরবে।

জীবন ডাক্তার বললেন, বলা শক্ত। গ্রামের লোক এখনও ডাক্তারি ওষুধকে তেমনভাবে মেনে নিতে পারেনি। ভয় পায়। তা ছাড়া ওরা কলেরা, বসন্তের মতন দু-চারটে লোগ শুধু চেনে। হার্ট, লাঙস কিংবা ব্লাড প্রেশারের রোগের কথা টের পেতে পেতেই কাবার হয়ে যায়। এক-এক সময় আমার মনে হয়, ডাক্তারি না করে আমি যদি সাধু বা ফকির-এর ভেক নিতাম, তাহলে ঝাড়ফুক মন্ত্রতন্ত্রর ভেলকির নাম করে অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ গেলালে আরও অনেক বেশি লোককে বাঁচাতে পারতাম।

তাতে অভিনয়ের প্রয়োজন হয়।

সেইটাই তো কথা!

ওই মাঝিটার মতন যদি আমার অবস্থা হত, সংসারে যদি আর কেউ না থাকত, তাহলে কি আমি ফিরে যেতাম?

মাঝিদের মুশকিল এই, ওরা জল ছেড়ে বেশিক্ষণ থাকতে পারে না। প্রত্যেক মানুষেরই একটা আলাদা আলাদা জায়গা আছে। সেখানেই সে বেশি স্বাধীন।

লোকটাকে আমার হিংসে হয়। এ-রকম খোলা আকাশের নীচে যদি জীবনটা কাটাতে পারতাম।

কি নিশি, বৈরাগ্য এসেছে নাকি? তোমার ছেলে-মেয়ে আছে, সংসার আছে, তার সুখ কি কম?

সুখ?

আমি কিন্তু ওইরকম সুখই চেয়েছিলাম।

জীবন, তোমার কি এখনও আপশোস আছে?

জীবন ডাক্তার একটা বড় নিশ্বাস ফেলে বললেন, না, আপশোস নেই। তবে বুঝতে পারছি আমার সময় ঘনিয়ে এসেছে।

নিশানাথ তাঁর বন্ধুর হাত চেপে ধরলেন। জীবন ডাক্তার ক্লান্তভাবে হেসে বললেন, সত্যিই। আমি টের পেয়ে গেছি।

এলাহাবাদে ডাক্তার হিসেবে যথেষ্ট পসার ছিল জীবন ডাক্তারের। তা ছাড়া শ্বশুরের সম্পত্তি পেয়েছিলেন। লোকের হিংসা জন্মাবার মতন যথেষ্ট সচ্ছলতা ছিল। কিন্তু পর পর চারটি সন্তান হয়েও বাঁচল না। জীবন ডাক্তার এত বড়ো পরাজয়ে খেপে উঠেছিলেন, কোনোরকম পরীক্ষা করাতে বাকি রাখেননি। তৃতীয়বার গর্ভবতী সাবিত্রীকে তিনি নিয়ে গিয়েছিলেন ইংল্যাণ্ডে। সেখানেও বাঁচানো যায়নি সদ্যোজাত সন্তানকে। সেখানকার ডাক্তাররা বলেছিল সাবিত্রীর শরীরে কোনো খুঁত নেই।

দারুণ আঘাত পেয়েছিলেন জীবনময়। স্ত্রী বন্ধ্যা হলে তাকে ত্যাগ করে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করার রেওয়াজ ছিল একসময়। কিন্তু নির্বীজ স্বামীকে মেয়েরা ত্যাগ করে না। তবু জীবনময় সাবিত্রীকে বলেছিলেন, আমার জন্য তুমি সন্তানহীনা থাকবে কেন? তোমার এখনও যৌবন আছে, তুমি আবার বিয়ে করতে পার! সাবিত্রী হেসে উঠে বলেছিলেন, কী পাগলের মতো কথা বল! নিজের ছেলে-মেয়ে নাই-বা থাকল, পরের ছেলে-মেয়েদের মানুষ করব!

তবু জীবনময় বুঝতে পারতেন। সাবিত্রী ভেতরে ভেতরে ক্ষয়ে যাচ্ছে। সন্তান না হওয়া আর চার-চারটি সন্তান হয়ে মারা যাওয়ার মধ্যে অনেক তফাত!

দ্বিতীয় পরাজয়টা এল অন্যভাবে। মাত্র চুয়াল্লিশ বছরে তাঁর হার্ট অ্যাটাক হল। এত লোকের চিকিৎসা করেছেন তিনি, অথচ নিজের শরীরের রোগটার সম্পর্কেই কিছু বুঝতে পারেননি। বহুবার তিনি বহুরুগির বাড়িতে গিয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছেন, মৃত্যুকে চ্যালেঞ্জ করেছেন, তাই মৃত্যু একটা ছোট্ট প্রতিশোধ নিয়ে গেল।

প্রথম অ্যাটাকই বেশ গুরুতর হয়েছিল। মাস তিনেক নার্সিংহোমে থাকবার পর যখন ফিরে এলেন, তখন তিনি অন্য মানুষ। রোগা, দুর্বল, ভীত। দেখে চেনাই যেত না, এই লোকটাই একসময় কত তেজস্বী ও অহংকারী ছিল। এরপর আর তাঁর কিছু করবার ছিল না। বাকি জীবন শুধু আর দু-টি স্ট্রোকের প্রতীক্ষায় বসে থাকা। সেদ্ধ খাবার খেয়ে আর পরিশ্রম বাঁচিয়ে সেই প্রতীক্ষাটা যতখানি দীর্ঘ করা যায়।

সেইভাবেই হয়তো জীবনটা কাটত। কিন্তু জীবনময় হঠাৎ একসময় একটা অন্যরকম সিদ্ধান্ত নিলেন। একবার গঙ্গাসাগর মেলায় বেড়াতে এসে এই এলাকাটা তাঁর খুব পছন্দ হয়েছিল। তিনি ঠিক করলেন, এখানেই খানিকটা জমি কিনে বাকিজীবনটা কাটাবেন। এলাহাবাদে তাঁর জীবন শেষ হয়ে গেছে। প্র্যাকটিস প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন—তাঁর চোখের সামনেই জুনিয়র ডাক্তারদের পসার বেড়ে যাওয়ায় একটু হিংসার জ্বালা বোধ করতেন। অসহায় হিংসা। একদিন মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিলেন সব। জীবনে যখন আর কিছুই পাওয়ার নেই, তখন যেটুকু দেওয়া যায়।

এলাহাবাদের বাড়িঘর সব বিক্রি করে জীবনময় চলে এলেন এখানে এই গঙ্গার ধারে। সাবিত্রী একটুও আপত্তি করেননি। প্রথমে ওঁরা ভেবেছিলেন, এখানে একটা ছোট্ট বাড়ি করে নিরিবিলিতে বাকি ক-টা বছর কাটিয়ে দেবেন। জীবনময় তাঁর মৃত্যুর পর সাবিত্রীর জন্য আলাদা ব্যবস্থা করে রেখে দিলেন। কিন্তু তাঁর শরীর ধীরে ধীরে বেশ সুস্থ হয়ে উঠতে লাগল। তিনি বুঝতে পারছিলেন এটা প্রলোভন। কিন্তু মাসের পর মাস মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করাও এক অসহ্য ব্যাপার। মৃত্যু যেন আবার তাঁকে ভুলে গেছে।

একসময় জীবনময় আবার স্বাস্থ্যের নিয়মকানুন অগ্রাহ্য করতে লাগলেন। দেখাই যাক-না কী হয়! আবার তিনি রোগী দেখা শুরু করলেন, নিজে ঘুরে ঘুরে গ্রামে গ্রামে গিয়ে রোগী খুঁজে বেড়াতেন। তাঁর নিজের আয়ু যখন সংক্ষিপ্ত, তখন অন্যদের আয়ু বাড়াবার জন্য জেদ ধরলেন। এটাও যেন মৃত্যুর প্রতি একটা চ্যালেঞ্জ। এখন আসুক সে, জীবনময় মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলবেন, তুমি আমাকে নিয়ে যেতে পার। কিন্তু আমিও অন্তত এক হাজার মানুষকে তোমার মুখের গ্রাস থেকে বাঁচিয়েছি!

দেখতে দেখতে সাত বছর কেটে গেল। জীবনময় এখন রোদুরে ঘোরেন, বৃষ্টিতে ভেজেন, রাত্তির বেলা কোনো রুগির খারাপ খবর শুনলে ছুটে যান। মৃত্যুকে তিনি একেবারে অগ্রাহ্য করতে পেরেছেন।

এদিকে স্থায়ী হয়ে বসবার পর তিনি কলকাতায় তার কলেজজীবনের পুরোনো বন্ধুদের মধ্যে দেবেন আর নিশানাথের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। দেবেন এসেছিলেন দু-একবার। কিছু সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন। প্রথমবার যখন ডাকাতি হল, রাত্তির বেলা একদল লোক এসে জীবনময়ের বাড়ি থেকে বেশ কিছু জিনিস নিয়ে গেল, সেবার দেবেন কিছু অর্থ সাহায্য করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন একটা ছোটোখাটো হাসপাতাল তৈরি করে দিতে। জীবনময় রাজি হননি। তার বদলে তিনি গ্রামের লোকদের দিয়ে মাটি কাটিয়ে, ইটখোলা করে সেই ইটে হলঘরটা বানিয়েছেন। দেবেন আর আসে না।

নিশানাথ প্রথম একবার আসার পর থেকে প্রায় প্রতিসপ্তাহে আসেন নিয়মিত। এখন পাশাপাশি দু-একখানা গাঁয়ের অনেক লোকই তাঁকে চেনে। বদমেজাজি বলে সমীহও করে।

জীবনময়কে এখানে কাজ করতে দেখে নিশানাথ প্রথম প্রথম খানিকটা অপরাধ বোধ করতেন। জীবনময়ের আয়ু ফুরিয়ে এসেছে তবু তিনি অপরের উপকারের জন্য পাগলের মতন খাটছেন। আর নিশানাথ কী করছেন, কিছুই না! শুধু চাকরি আর সংসার!

সারাজীবন তিনি একটা সততার আদর্শ আঁকড়ে ধরে থাকার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু কোনো রূপ দিতে পারেননি।

জীবনময়ের কোনো সন্তান নেই, সেইজন্য দুঃখ। কিন্তু তাঁর তত তিনটি ছেলে-মেয়ে–তাতেই বা কী লাভ হল? কেউ তো তাঁর মনের মতন হয়ে উঠল না!

কিছুদিন এখানে এসে বন্ধুকে সাহায্য করার পর নিশানাথ অনুভব করলেন, এখানেই তাঁর মনের আপন মুক্তি। এই খোলা আকাশ, গ্রামের সরল মানুষ তাদের মুখে একটু হাসি ফোটানো–এতে যে আনন্দ, তা তো আগে কখনো পাননি।

নিশানাথ বললেন, তুই কাল আমার সঙ্গে কলকাতায় চল। বছর খানেকের মধ্যে তোর ই সি জি করানো হয়নি।

জীবনময় বললেন, আমি সেজন্য ভাবছি না। আমি ছোট্ট একটা জিনিস করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু দেখতে দেখতে সেটা এত বড়ো হয়ে গেল! এখন অনেক লোক আমার ওপর নির্ভর করে। এখন যদি আমি হঠাৎ চলে যাই–এসবই কি তাসের ঘরের মতন ভেঙে যাবে?

অন্য কেউ এসে ভার নেবে।

কে ভার নেবে?

আমার তো সে সাধ্য নেই, আমি তোর মতন ডাক্তারিও জানি না, মানুষকে কী করে সেবা করতে হয়, তাও জানি না। আমার ইচ্ছে করে, যেখানে যত কিছু অন্যায়, সব ভেঙে দিতে। কিন্তু এখন বুঝেছি, সে শক্তিও আমার নেই। আমি না পারলাম ঠিকমতন সংসার করতে না পারলাম বাইরের মানুষের জন্য কিছু করতে।

তুই অনেক কিছু করেছিস!

আমার ছেলেটাকে এইজন্যই এনেছি, তুই একটু গড়েপিঠে মানুষ করে নে। ভেবেছিলাম বি এসসি-টা যদি ভালোভাবে পাশ করে, তা হলে ওকে ডাক্তারি পড়াব। ধার দেনা করেও পড়াতুম। কিন্তু পড়াশুনোয় ওর মন নেই। জেদ ধরে কোনো কিছু করার সাহসও নেই। তোর এখানে থাকলে হাতে-কলমে কাজ শিখবে, পৃথিবীটাকে চিনবে। আমার ছেলেটাকে তুই নিয়ে নে!

ওর এখানে মন টিকবে কেন? ও তো তোর মতন গ্রাম থেকে আসেনি, শহরেই মানুষ।

কিছুদিন থাকলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

তোর স্ত্রী রাজি হবেন কেন? মণীশের খবর কী?

কী জানি, তার খবর আমি রাখি না।

ওই ছেলেটার মধ্যে তেজ ছিল!

সেই তেজে লাভ কী, যার মধ্যে সততা নেই? আজকাল যারা নষ্ট, যারা ঠগ, তারাই বেশি চেঁচিয়ে কথা বলে।

জীবনময় হঠাৎ যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেছেন। একটু দূরের দিকে তাকিয়ে বললেন, আজকের বাতাসটা কী সুন্দর! কীসের যেন একটা মিষ্টি গন্ধ আছে। খুব ছেলেবেলায় একবার নদীর ধারে এসে–

কথা শেষ না-করে থেমে গেলেন তিনি। যেন এই সুন্দর পৃথিবী, সুঘ্রাণ বাতাস, মাঠের মধ্যে সাদা রঙের বাড়ি–এইসব কিছু ছেড়ে অকস্মাৎ একদিন চলে যেতে হবে, এইকথা তাঁর মনে পড়ল।

নিশানাথ বন্ধুর এই ভাবান্তর লক্ষ করলেন না। তিনি বললেন, বাঃ বেশ ভালো ফুল এসেছে তো। গত সপ্তাহেও দেখিনি।

অনেকখানি জায়গা জুড়ে বেগুন খেত। এদিককার মাটিতে নোনা জলের জন্য ফলন ভালো হয় না। নিশানাথই উদ্যোগ করে দূর থেকে এক লরি মাটি এনে ফেলেছিলেন। কুয়োতে পাম্প বসিয়ে জল আনা হয়েছে। তবু ভয় ছিল। এমন নধর বেগুন চারায় সাদা সাদা ফুল দেখে তাঁর চোখ জুড়িয়ে গেল। যেন একটা সৃষ্টি। কোনো কোনো গাছ বৃষ্টিতে একটু হেলে আছে, কিছু আগাছাও পরিষ্কার করে দেওয়া দরকার। নিশানাথ খেতের মধ্যে নেমে পড়লেন।

জীবনময় বললেন, নিশি, এখন থাক-না।

নিশানাথ বললেন, আবার বৃষ্টি আসবার আগে মাটিটা ঠিক করে দিই।

কাদামাখা জমিতে উবু হয়ে বসে আগাছা নিড়াতে লাগলেন নিশানাথ। জীবনময় দূরে দাঁড়িয়ে রইলেন। খেতের চারধারে কলা গাছ পোঁতা হয়েছে। সেগুলো এখন এক-মানুষ উঁচু। নবীন কলা গাছ থেকে যেন একটা হলুদ-সবুজ আভা বিচ্ছুরিত হয়। দুটো ঝুঁটিওয়ালা বুলবুলি ওড়াউড়ি করছে একটা বাবলা গাছের মাথায়। বড়ো মায়াময় দৃশ্য। জীবনময়ের চোখে জল এসে যায়।

দু-কাপ চা খুব সাবধানে ধরে নিয়ে এল উমা। জীবনময়কে এক কাপ চা দিয়ে চাপা গলায় বলল, একটা ছেলেকে নিয়ে এসেছে, পেটে খুব ব্যথা বললে—

ঘোর ভেঙে জীবনময় বললেন, কত বয়েস?

আঠারো-উনিশ হবে। এমন কাতরাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল অ্যাপেনডিক্স ফেটে গেছে।

চল যাচ্ছি।

—ব্যস্ত হয়ো না। চা-টা খেয়ে নাও। আমি একটা পেথিডিন ইঞ্জেকশন দিয়ে দিয়েছি।

জীবনময় আরও চমকে উঠে বললেন, পালসটা দেখেছিলি তো?

এক চুমুকে চা-টা শেষ করে জীবনময় খালি কাপটা নিয়ে হনহন করে চলে গেলেন।

উমা ডাকল, নিশিদা, নিশিদা, আপনার চা!

খেতের মধ্য থেকে নিশানাথ উত্তর দিলেন একটু পরে।

ঠাণ্ডা হয়ে যাবে যে।

তুমি খেয়ে নাও। আমি অত চায়ের ভক্ত নই।

না, না, আসুন। আমি চা খেয়েছি।

জল-কাদা মেখে নিশানাথ এগিয়ে এলেন। উমা ভর্ৎসনা করে বলল, খেয়ে উঠেই আবার এইসব করতে গেছেন?

জীবন কোথায় গেল?

একটা রুগি এসেছে, দাদা একটু দেখে আসতে গেছে।

নিশানাথ চায়ের কাপটা নিয়ে চুমুক দিয়ে বললেন, মিষ্টি কম হয়েছে।

আপনার আর কিছুতেই মিষ্টি ঠিক হয় না। চিনি নিয়ে আসব? আনতে আনতেই তো চা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

থাক। আজ সন্ধ্যে বেলা গ্রামে যাত্রা-গান আছে না?

আছে বোধ হয়।

যাবে নাকি?

অনেকবার দেখেছি। আর ভালো লাগে না।

আমার বেশ লাগে। সিনেমা-থিয়েটারে আমি কোনো রস পাই না।

আপনি যাত্রায় নামলে পারতেন। আপনাকে বেশ মানাতো। ভীমের পার্টে যা চমৎকার দেখাতো আপনাকে!

নিশানাথ উমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। উমা প্রায়ই তাঁর সঙ্গে ঠাট্টার সুরে কথা বলে। গোধূলির আকাশের দিকে ফিরে সে দাঁড়িয়ে আছে। বাতাসে উড়ছে চুল। তার চোখে বৈধব্যের কোনো ক্লান্তি নেই। ঠোঁটে অল্প হাসির রেখা।

নিশানাথ চোখ নামিয়ে নিলেন। আস্তে আস্তে বললেন, তা মন্দ বলনি। সুযোগ পেলে না হয় যাত্রার দলেই ভিড়ে যেতাম।

কেন এ-জীবনটা বুঝি আর পছন্দ হচ্ছে না?

কিছুই তো হল না। সব জায়গায় হেরে গেলাম।

আত্মগ্লানি ভালো নয়। আপনিই তো বলেছেন, আত্মগ্লানিতে মানুষের কাজের শক্তি কমে যায়।

তা ঠিকই। মানুষের জীবনে কতরকমের স্বপ্ন থাকে, একটা জীবনে সব কুলিয়ে ওঠা যায় না।

উমার মুখটা একটু ম্লান হয়ে গেল। যেন তারও মনে পড়ল এ-রকম কোনো স্বপ্নের কথা। দীর্ঘশ্বাস লুকিয়ে বলল, তাও তো আপনি অনেক কিছু করেছেন। মানুষের তো একটু বিশ্রামেরও দরকার।

এখানে এলেই তো আমার বিশ্রাম হয়।

এর নাম বিশ্রাম? দৈত্যের মতন তো খাটেন দেখি। আগের রবিবার সারাদিন ধরে কী কান্ডটাই করলেন। কুয়ো কাটা কি চাট্টিখানি কথা!

আমি তো ওইটুকুই করতে পারি। বিদ্যা-বুদ্ধি তো তেমন নেই। টাকাপয়সারও জোর নেই। গায়ে খেটে যেটুকু সাহায্য করতে পারি সেইটুকু করি। সারাসপ্তাহ অফিসে কলম পিষি। সবসময় ঘেন্নায় গা গুলোয়। সন্ধ্যে বেলা হাতজোড় করে বলি, মা, আমাকে মুক্তি দাও। কবে এর থেকে মুক্তি পাব? মুক্তি নেই, তাও বুঝি?

আপনার তো রিটায়ার করার বয়েস হয়ে এল।

তবু আমার রিটায়ারমেন্ট হবে না। একটা-না-একটা কিছু করতেই হবে। সংসার চালাবার দায় তো আছে।

পুরুষমানুষকে দুঃখ করতে দেখলে আমার ভালো লাগে না।

দুঃখ করছি না। এমনিই মনে এল তাই বললাম।

আপনার কথা শুনলে মনে হয়, আপনি কখনো হার স্বীকার করবেন না।

নিশানাথ হাসলেন। তারপর বললেন, তা ঠিক! হারব কেন? জীবন বলছিল, ওর যদি হঠাৎ কিছু হয়, এই সব কিছুই নষ্ট হয়ে যাবে! আমি তা কিছুতেই হতে দেব না। দরকার হলে বাড়িঘর ছেড়ে আমি এখানেই এসে থাকব। কী উমা, আমরা সবাই মিলে পারব না এটাকে বাঁচিয়ে রাখতে?

ওপরের আকাশ থেকে একটা পাতলা চাদরের মতন অন্ধকার নেমে এল। উমার মাথার ওপরে এসে পড়ল। উমাকে এখন আর স্পষ্ট দেখা যায় না। সে হাত দিয়ে কপালের চুল সরালো। তারপর নিম্নস্বরে বলল, আপনার শখের লেবু গাছগুলো একবার দেখলেন না? চলুন দেখে আসি।

নিশানাথ বললেন, সন্ধ্যে হয়ে গেছে, এখন আর পুকুরধারে গিয়ে কাজ নেই। কাল সকালে গেলেই হবে। তোমাদের এখানে সাপখোপ বড় বেশি।

আমাদের সহ্য হয়ে গেছে। পরশু তো আমার ঘরের সামনেই একটা সাপ এসেছিল।

কী সাপ? বিষ আছে?

খুব বিষ। শিয়রচাঁদা!

ভয় পাওনি?

আমি নিজেই তো সেটাকে মারলাম। দাদার কুসংস্কার আছে, দাদা সাপ মারতে চায় না।

ও তো কিছুই মারতে চায় না। প্রাণ বাঁচানোই ওর কাজ। চলল, দেখা যাক জীবন কী করছে।

দু-জনে মন্থরভাবে হাঁটতে লাগল মাঠের মধ্যে দিয়ে। উমা সামনে যাচ্ছে, নিশানাথ সতর্কভাবে মাটির দিকে দেখছেন। হঠাৎ উমা একটা হোঁচট খেতেই নিশানাথ বললেন, কী হল?

তিনি উমাকে ধরার জন্য হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু ধরলেন না। উমা নীচু হয়ে বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলটা চেপে ধরে বলল, কিছু হয়নি। তার নখের কোণ দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে, অন্ধকারে নিশানাথ তা দেখতে পেলেন না। উমা আবার সোজা হয়ে উঠে বলল, চলুন। ব্যথা চাপবার জন্য তার মুখে একটা অন্যরকম হাসি ফুটে উঠেছে।

জীবনময়ের বাড়িতে ইলেকট্রিক নেই। তাই জ্বালানো হয়েছে দুটো হ্যাজাক। কয়েকটি ছেলে উঠোনে বসে বাঁশের বেড়া বুনছে, আর একটা ঘর তৈরি হবে। সুব্রত ঘুম থেকে উঠে বসে আছে বারান্দায়, ফ্যাচর ক্যাচর করে হাঁচছে মাঝে মাঝে।

উমা তাকে দেখে বলল, ঘুম ভেঙেছে? এখানে বসে আছ কেন? একটু ঘুরে বেড়িয়ে এলে পারতে।

সুব্রত লাজুকভাবে বলল, যাচ্ছি!

এখন আর এই অন্ধকারে একা একা যেয়ো না। যাত্রা দেখতে যাবে নাকি? ভালো যাত্রা আছে।

সুব্রতর কিছুই ভালো লাগছে না। তার বুকে ঠাণ্ডা বসে গেছে। ম্যাজম্যাজ করছে শরীর।

বোধ হয় জ্বরও এসেছে। যাত্রা দেখতে যাওয়ার তার একটুও ইচ্ছে নেই।

জীবনময় হলঘরের মধ্যে রুগি দেখছেন। কাটাপাঁঠার মতন ছটফট করছে একটি ছেলে। সুব্রতরই বয়েসি।

উমাকে দেখে জীবনময় বললেন, তুই ঠিকই ধরেছিলি। এর অ্যাপেনডিক্স ফেটে গেছে, অপারেশন করা দরকার। হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারলে ভালো হয়। অবশ্য অতদূর পৌঁছোবে কি না সন্দেহ।

হাসপাতাল এখান থেকে এগারো মাইল দূরে। তার অর্ধেক রাস্তাই যেতে হবে গোরুর গাড়িতে।

ছেলেটির বাবা ও আরও দু-জন আত্মীয় কাছেই বসে আছে উবু হয়ে। তারা বলল, ডাক্তারবাবু, আপনিই যা-হোক ব্যবস্থা করুন।

জীবনময় বিরক্তভাবে বললেন, এখানে কি সব কিছু হয়? অপারেশন করার সব জিনিসপত্র কি আমার আছে?

ছেলেটির বাবা হঠাৎ বিশ্রীভাবে কান্না শুরু করে দিল। অসহায় লোকদের যা একমাত্র অস্ত্র।

নিশানাথ জিজ্ঞেস করল, অপারেশন না করে আর কিছু করা যায় না?

জীবনময় দু-দিকে ঘাড় নাড়লেন। তারপর বললেন, এসব কেস হাসপাতালেই পাঠানো উচিত। যদিও এখানকার হাসপাতালের ওপরেও আমার ভরসা নেই। মফসসলের হাসপাতাল দেখেছিস কখনো? নরক দর্শনের আর কিছু বাকি থাকে না।

ছেলেটির মুখ দিয়ে গাঁজলা বেরোচ্ছে। তার ঠিক জ্ঞান নেই, তবু গোঁ গোঁ শব্দ করছে মাঝে মাঝে। সেই শব্দে বাইরের কয়েকজন দরজার কাছে ভিড় জমালো।

জীবনময় ছেলেটির বাবার দিকে ফিরে বললেন, কান্না থামান এখন। একবার গোঁসাইবাবার কাছে নিয়ে গিয়ে চেষ্টা করে দেখুন-না। আমার ছেলেরাই পৌঁছে দিয়ে আসবে।

নিশানাথ অবাক হয়ে তাকালেন জীবনময়ের দিকে। জীবনময় বললেন, গোঁসাইবাবা ঝাড় ফুক করে অনেক লোককে সারায়। কী করে সারায় তা জানি না, কিন্তু সেরে তো যায় দেখি! যদি সেখানে কিছু উপকার হয় তো হোক-না।

ছেলেটির বাবা কাঁদতে কাঁদতেই বলল, গোঁসাইবাবার কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তিনি জবাব দিয়েছেন।

কেন?

আজ ওনার উপপাসের দিন। আজ উনি কারুকে ছোঁন না!

জীবনময় নিশানাথকে বললেন, দেখলে? আগেই ঘুরে এসেছে সেখান থেকে। তা হলে আর কী হবে? আমি আরও ব্যথা কমাবার ইঞ্জেকশন দিয়ে দিচ্ছি। তারপর চেষ্টা করে দেখুন, যদি হাসপাতালে পাঠানো যায়।

হাসপাতালের ডাক্তারবাবুর অসুখ।

জীবনময়ের ঠোঁটে একটা ম্লান হাসি ফুটে উঠল। যেন তিনি বুঝতে পারলেন, এটাও মৃত্যুর একটা খেলা। স্বয়ং মৃত্যুই যেন এইসব রুগিকে তাঁর কাছে পাঠায়।

তিনি কম্পাউণ্ডারকে বললেন, তোলো একে অপারেশনের টেবিলে। শুনুন। আপনাদের একটা ফর্ম ফিলাপ করে দিতে হবে। অর্থাৎ আপনারা লিখে দিচ্ছেন যে, আপনারা স্বেচ্ছায় আমাকে দিয়ে এই অপারেশন করাতে রাজি হয়েছেন। উমা, ফর্মটা দে ওদের।

হলের একপাশে একটা অপারেশন টেবিল রয়েছে। খুব দরকারে দু-একটা ছোটোখাটো অপারেশন করতেই হয়। এলাহাবাদে জীবনময়ের প্র্যাকটিস ছিল চাইল্ড স্পেশালিস্ট হিসেবে, এখানে চিকিৎসা করতে হয় সব কিছুরই।

নিশানাথই ছেলেটিকে কোলে করে টেবিলে তুলে দিলেন। কম্পাউণ্ডার যন্ত্রপাতি এনে সাজাতে লাগল। উমা এখানে থেকে থেকে অনেক কিছুই শিখে গেছে। অ্যানিস্থিসিয়া সে-ই দেবে।

দুটো হ্যাজাক লাগানো হয়েছে টেবিলের দু-পাশে। ছুরি হাতে নেওয়ার পরও জীবনময় বেশ কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন ছেলেটির দিকে। মৃদু গলায় নিশানাথকে বললেন, অপারেশনটা এমন কিছু নয়, কিন্তু আমার অনেকদিন অভ্যেস নেই, তা ছাড়া আমার হাত কাঁপে আজকাল, ঠিক ভরসা পাই না–

নিশানাথ বললেন, এ ছাড়া যখন আর উপায় কিছু নেই–

ছেলেটা গাছ থেকে পড়ে গেছে। গ্রামে এমন অনেক ছেলেই গাছ থেকে পড়ে মারা যায়। একে শুধু শুধু আমার কাছে আনা হয়েছে নিমিত্তের ভাগী করার জন্য।

চেষ্টা করা হচ্ছে, সেইটাই বড়োকথা।

আর একটা জিনিস লক্ষ করে দেখ। ছেলেটার চেহারা দেখেছিস? পেটটা মোটা, হাত দুটো সরু সরু, বুকের খাঁচাটা ছোটো–একটা যুবক ছেলের এই কী চেহারা? অথচ বেশিরভাগ

লোকের চেহারাই আজকাল এইরকম। কী খায়? আজেবাজে জিনিস দিয়ে কোনোরকমে পেট ভরাচ্ছে। শরীরে কোনো রেসিসটেন্স নেই। অপারেশনের ধকল সহ্য করতে পারবে কি না সেটাই সন্দেহ।

তুই এত চিন্তা করছিস কেন?

নিশি, যদি আমার হাত কাঁপে!

কিছু হবে না।

জীবনময়কে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। অসহায়। তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর পেছন ফিরে তাকালেন।

ঘরের মধ্যে ভিড় হয়ে গেছে। সুব্রতও এসে দাঁড়িয়েছে টেবিলের পাশে। জীবনময় গম্ভীরভাবে বললেন, সবাই বাইরে যাও।

সকলে পিছিয়ে যেতে লাগল। নিশানাথও ছেলেকে বললেন, চল, বাইরে চল।

নিশা তুই থাক।

আমি কাছেই থাকব।

উমা আর কম্পাউণ্ডার শুধু ভেতরে রইল। নিশানাথ বাইরে এসে দরজার কাছে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন। যতক্ষণ অপারেশন শেষ না হয়, তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন সেখানে। অন্যরা ফিসফাস গুজগুজ করে কথা বলছে। তিনি নিঃশব্দ।

প্রায় চল্লিশ মিনিট বাদে বেরিয়ে এলেন জীবনময়। চোখ-মুখ খুব ক্লান্ত হলেও ঠোঁটে একটা অদ্ভুত সুন্দর হাসি। নিশানাথকে কিছু জিজ্ঞেস করতে হল না। ওই হাসিটা দেখেই বুঝলেন।

নিশানাথ হাতটা চেপে ধরলেন জীবনময়ের। জীবনময় বললেন, মনে হয় বেঁচে যাবে। ছেলেটির আত্মীয়দের উদ্দেশে বললেন, আপনাদের মধ্যে একজন অন্তত এখানেই থেকে যান রাত্তিরটা। খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত এখানেই হয়ে যাবে।

নিশানাথ বুকের মধ্যে সামান্য একটু ব্যথা অনুভব করলেন। হঠাৎ যেন জীবনময়কে তাঁর হিংসে হচ্ছে। তিনি ভাবলেন, আমি কি জীবনে এমন একটি কাজও করতে পারব না, যাতে ওইরকম সুন্দরভাবে হাসতে পারি? কতখানি তৃপ্তি আর অহংকার মিশেছিল ওই হাসির সঙ্গে!

তিনি ছেলেকে খুঁজতে লাগলেন।

সুব্রত বারান্দা থেকে নেমে উঠোনে দাঁড়িয়ে ছিল। নিশানাথ তার কাছে গিয়ে খুব নরম গলায় বললেন, খোকন, তোর কেমন লাগছে এই জায়গাটা? তোর এখানে থাকতে ইচ্ছে করে না? তুই এখানে থাকবি?

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সুব্রত বলল, না।

১৬. তিনতলায় টেলিফোন বাজছে

তিনতলায় টেলিফোন বাজছে, অনিন্দ্য তখন একতলায়। ইলেকট্রিকের লাইন সারাচ্ছিল। বাড়ির এইসব কাজ সে নিজেই করে। ওপরের বারান্দা থেকে ঝি বলল, ছোড়দাদাবু, আপনার টেলিফোন!

এখন সারাদিন কোনো কাজ নেই। বই পড়ে পড়ে চোখ ব্যথা হয়ে যায়। মুম্বই যাওয়ার ব্যাপারটা এখনও ঠিক হয়নি। তেহরানে মা কিছুতেই যেতে দিলেন না।

তবে আজ কিছুক্ষণ আগে একটা উত্তেজক কাজ পাওয়া গিয়েছিল। একটা চোর ধরা পড়েছে। একটা রোগা মতন বারো-তেরো বছরের ছেলে ঢুকে পড়েছিল বাড়ির মধ্যে। কী সাহস, উঠে গেছে একেবারে দোতলায়। দুপুর বেলা সারাবাড়ি নিস্তব্ধ, সদর দরজাটাও খোলা ছিল, ছেলেটা অনিন্দ্যর রেডিয়ো আর ঘড়ি ঠিক চুরি করে পালাতো। পুরোনো চাকর রঘু সহায় হঠাৎ দেখে ফেলেছে।

রঘু সহায় বোধ হয় ছেলেটাকে মেরেই ফেলত, অনিন্দ্য কোনোরকমে আটকেছে। এত রোগাপটকা ছেলেকে মেরে হাতের সুখ নেই।

বরং অনিন্দ্য মনে মনে একটু হেসেছিল। তাদের মতন একটা ডাকাতের বাড়িতে চুরি করতে এসেছে ওইটুকু এক পুঁচকে! তার বাবা পারমিট চুরির দায়ে প্রায় ধরা পড়ে যাচ্ছিলেন। দাদারও এখন অঢেল ব্ল্যাকমানি। আধুনিককালে এগুলোরই নাম ডাকাতি। আর এই বেচারা সেই পুরোনো টেকনিকেরই চোর রয়ে গেল।

থানায় ফোন করা হয়েছিল। পুলিশ বলেছে, ছেলেটাকে থানায় জমা দিতে। অনিন্দ্যর মা আপত্তি করেছেন। রাস্তা দিয়ে অনিন্দ্য ওই চোরকে হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। বরং বিকেল বেলা দাদা বাড়িতে আসুক, তারপর যা হয় ব্যবস্থা করা যাবে। চোরটাকে আটকে

রাখা হয়েছে ভাঁড়ারঘরে। টেলিফোনের কথা শুনে অনিন্দ্য ভাবল, আবার বুঝি থানা থেকেই কিছু বলছে?

হাতের কাজ ফেলে রেখে অনিন্দ্য তরতর করে ওপরে উঠে এল। ওপাশ থেকে পলার গলা।

অনিন্দ্য বলল, কী ব্যাপার? হঠাৎ?

পলা খানিকটা নম্র ও লজ্জিতভাবে বলল, এমনিই, বিশেষ কিছু কারণ নেই। তুই কেমন আছিস?

আমি খারাপ থাকব কেন?

না, মানে, শরীর-টরীর ভালো আছে তো?

চমৎকার আছে।

আমি ভাবছিলাম, তোর আবার জ্বর-টর হয়ে গেল কি না। কপালটা কি এখনও ফুলে আছে?

মোটেই না।

শোন অনিন্দ্য, দু-দিন ধরে আমার মনটা বড্ড খারাপ হয়ে আছে। সেদিন আমরা রাগের মাথায় এমন বিশ্রী কান্ড করলাম। দেবযানী তোর মাথাটা অত জোরে ঠুকে দিল, খুবই অন্যায় করেছে।

দেবযানী মাথা ঠুকেছে, তুই ঠুকিস নি তো?

কক্ষনো না। আমি বরং ওদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছিলাম।

অনিন্দ্যর মুখে একটা পাতলা হাসি ফুটে উঠল। একবার তাকাল দরজার দিকে। সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই আছে দোতলায়। একতলায় ইলেকট্রিক তারের মুখ খোলা রয়েছে, মেইন সুইচ অফ করা হয়নি, কেউ ছুঁয়ে ফেললেই দারুণ শক খাবে। তবু সে তরল গলায় বলল, আমি ঠিক জানতাম, আমার সম্পর্কে তোর খানিকটা দুর্বলতা আছে।

তুই মাঝে মাঝে এমন সব খারাপ কথা বলিস! যদিও জানি, সেগুলো ঠিক মিন করিস না –তাই রাগ হয়ে যায়। পরে ভেবে দেখলাম, সামান্য মুখের কথা তো, আর তো কিছু না, তাতেই আমাদের অতখানি রেগে যাওয়া মোটেই উচিত হয়নি। দেবযানীর আবার বড় বেশি বেশি রাগ।

রাগলে ওকে বেশি ভালো দেখায়।

তাই বুঝি?

কেন, তুই লক্ষ করিস নি?

ওসব ছেলেরাই লক্ষ করে। আমরা অত বুঝি না। তবে দেবযানী তো সুন্দরীই, সবাই ওকে সুন্দর বলে।

পলা তোর থেকে সুন্দর নয় অবশ্য।

বাজেকথা বলিস না। আমি দেখতে কীরকম, তা আমি ভালোরকমই জানি। তবে আমার কিন্তু দেব্যানীর থেকে শিখাকেই দেখতে বেশি ভালো লাগে। নাক-চোখ-মুখ কোনোটাই আলাদা করে বেশি সুন্দর নয় হয়তো, কিন্তু সব মিলিয়ে বেশ একটা ব্যক্তিত্ব আছে শিখার মধ্যে।

তোদের তিনজনের মধ্যে তোর চোখ দুটোই সবচেয়ে সুন্দর।

আবার ইয়ার্কি হচ্ছে! এই শোন, তার সঙ্গে ওদের আর দেখা হয়েছিল?

কাদের?

শিখা, দেবযানীর।

না?

আমি ওদের বলেছিলাম, অনিন্দ্যকে ডেকে মিটমাট করে নিতে। এমন একটা বিচ্ছিরি ব্যাপার হয়ে গেল, কিন্তু দেবযানীটা এমন ন্যাকা।

বেশ ন্যাকা আছে, তাই না? ছে

লেবেলা থেকে সকলের মুখে সুন্দর, সুন্দর শুনছে তো, তাই সবসময় একটা নেকু নেকু ভাব করে থাকে।

অনিন্দ্য নিঃশব্দে হাসতে লাগল। তার চোখ দুটো ঝকঝক করছে এখন। এই বিশ্রী গুমোট দুপুরে সে আর একটা চমৎকার আনন্দ পেয়ে গেল।

দেবযানী কি আমার ওপরে এখনও রেগে আছে?

খুব।

ঠিক আছে, আমি ওকে আরও রাগিয়ে দেবার ব্যবস্থা করব।

এই, যা, অনিন্দ্য তুই আর খিছু করিস না, প্লিজ! তোর কী দরকার ওর সম্পর্কে মাথা ঘামানোর? ও রাগ করে থাকলে তোর কী আসে যায়?

এইসব ন্যাকা মেয়েদের একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার, না? নাহলে তো সারাজীবনই ন্যাকা থেকে যাবে।

তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু তুই কিছু করিস না। আমি অনুরোধ করছি।

আচ্ছা ঠিক আছে, তুই যখন বলছিস! জানিস তো, তোর কোনো কথা আমি অগ্রাহ্য করতে পারি না।

আহা! কী মন ভেজানো কথা! তোকে আর আমার চিনতে বাকি নেই।

সত্যি বলছি। পাইলট ভদ্রলোক তোকে আগেই কবজা করে নিয়েছে, না হলে আমি একবার চান্স নিতাম। তোকে আমার অনেক কথাই বলা হয়নি। একদিন তোকে স্বপ্নে দেখলাম।

খুব গুল ঝাড়ছিস।

বিশ্বাস করছিস না? তা হলে আমি কী করতে পারি! পাইলটদাদা এখন কোথায়?

ইস্তাম্বুলে গেছে, দু-দিন পর ফিরবে।

দেখিস, এয়ার হোস্টেসের সঙ্গে প্রেম করে না তো?

কী জানি! ছেলেদের তো বিশ্বাস নেই।

অনিন্দ্য রিসিভারে ঠোঁট রেখে চুঃ করে একটা লম্বা শব্দ করল। পলা চমকে গিয়ে বলল, ও কী?

তোকে একটা চুমু খেলাম।

আবার অসভ্যতা হচ্ছে?

বাঃ, এতদূর থেকে চুমু খেলেও দোষ? আমার অনেক দিনের একটা ইচ্ছে–

ঠাট্টা করছিস তো আমার সঙ্গে?

ঠাট্টা? তুই বুঝতে পারিস নি, আমি তোকে কতটা ভালোবাসি? আর একটা চুমু খাই?

আবার চুঃ শব্দ করে অনিন্দ্য বলল, এবার তুই একটা চুমু দে আমাকে?

অনিন্দ্য, আমি ফোন নামিয়ে রাখছি।

ঠিক আছে, ইচ্ছে করলে নামিয়ে রাখতে পারিস।

এইসব কথা শুনলে আমার ভয় করে, বিশ্বাস কর।

কেন, কেউ দেখে ফেলবে নাকি? টেলিফোনে চুমু খাওয়ায় তো সে ভয় নেই।

এসব কথা আমার শুনতে একটুও ইচ্ছে করে না। দুপুরটা একদম চুপচাপ, কিছুই করার নেই, যাচ্ছেতাইরকম গরম–এই সময় যদি... তুই এক বাড়িতে আর আমি অন্য বাড়িতে...কোনোরকম বিপদের ভয় নেই, তবু টেলিফোন যন্ত্রটা যখন আছে, এর একদিকে তুই ঠোঁট দিলি আর একদিকে আমি–মনে কর তোর নীচের ঠোঁটটা ঠিক আঙুর ফল খাওয়ার মতন টুপ করে আমার মুখে পুরে নিলাম, অপূর্ব মিষ্টি, তারপর তোর জিভের সঙ্গে জিভ লাগিয়ে উঁ, উঁ, উঁ।

অনিন্দ্য, প্লিজ, অনিন্দ্য।

খারাপ লাগল?

শোন তোকে একটা অন্য কথা বলছি, খুব জরুরি।

পলা, এবার তুই যদি আমাকে একটা চুমু না দিস, তাহলে খুব দুঃখ পাব।

ওসব কথা থাক, বলছি তো একটা জরুরি কথা আছে।

কোনো জরুরি কথা আমি শুনব না, আগে একটা চুমু না দিলে।

তোকে নিয়ে মহামুশকিল।

কী হল?

এই তো দিলাম।

বেশ ভালো করে, দু-ঠোঁটের মধ্যে আমার একটা ঠোঁট নিয়ে।

এইসব কথা শুনলেই ভয়ে আমার বুকটা দুপটুপ করে।

আমি তোর বুকে মাথা রাখলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আঁচলটা সরিয়ে দে একটু।

আবার অসভ্যতা হচ্ছে।

তুই কী জরুরি কথা বলবি বলছিলি।

শোন, সিটিজেন্স কমিটি থেকে কাল বেলেঘাটার একটা বস্তি সার্ভে করা হবে। আমরাও যাচ্ছি সবাই।

আমরাও মানে?

আমি, শিখা, ধৃতি, অরবিন্দ, দেবযানী।

তা হলে তো অনেকেই আছে।

তুইও আয়-না আমাদের সঙ্গে। এই, সুব্রতর খবর কী রে?

কী জানি!

ও সেই স্লিপিং পিল খেয়েছিল তারপর থেকে আর খবর পাইনি, যদি সুব্রতকে একটা খবর দেওয়া যেত।

হুঁ, হুঁ।

তুই আসছিস তো?

আঃ, কী চমৎকার!

কী হল? তুই শুনছিস না আমার কথা?

নিশ্চয়ই শুনছি–আমি তোর কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে আছি, কী সুন্দর গরম তোর বুক, মাঝে মাঝে বাচ্চাছেলের মতন আমি দুধ খাওয়ার জন্য–

ছি ছি ছি ছি ছি–তুই কি একটাও সিরিয়াস কথা শুনতে পারিস না?

–তোর ভালো লাগছিল কি না স্বীকার কর আগে।

–এই কে যেন আসছে এদিকে। পলা ঝন করে টেলিফোন নামিয়ে রাখল। হা-হা শব্দে হেসে উঠল অনিন্দ্য। পলা এমন ভাব করল যেন কেউ তাকে বেসামাল অবস্থায় দেখে ফেলেছে।

অনিন্দ্য দোতলায় নেমে এসে একটা সিগারেট ধরালো। তার মুখে বেশ একটা তৃপ্তির ভাব। চোখ দু-টি যদিও চঞ্চল, আরও কোনো একটা পরিকল্পনা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে।

আবার সে তিনতলায় উঠে এসে টেলিফোন তুলল। একটা নম্বর ঘুরিয়ে গম্ভীরগলায় জিজ্ঞেস করল, বাদল আছে?

ওপাশ থেকে উত্তর এল, না, বাদল বাড়ি নেই।

তপন, তপন আছে?

না, সেও নেই।

ওই দু-জন যে এ-সময় বাড়ি থাকে না তা অনিন্দ্য খুব ভালোভাবেই জানে। তবু গলায় বিরক্তি ফুটিয়ে বলল, তপনও নেই? তাহলে দেবযানীকেই ডেকে দাও একবার।

আপনি কে বলছেন?

আমি রিজেন্ট পার্ক থেকে বলছি, তপনের ছোটো মামা।

ধরুন ডেকে দিচ্ছি।

দেবানীর মা নেই। না হলে ছোটোমামার ভাঁওতাটা খাটত না। যদি দেবযানীর কাকা ফোন ধরত তাহলেও গলার আওয়াজ চিনে ফেলত। ওদের বাড়িতে বড্ড কড়াকড়ি।

দেবযানী এসে ফোন তুলতেই সে বলল, আমি ছোটোমামা নই।

হ্যালো, কে?

আমি অভিজিৎ পালিতও নই।

কে আপনি?

আমি অনিন্দ্য।

সঙ্গে সঙ্গে দেবানী ফোন ছেড়ে দিল।

কৌতুকহাস্যে অনিন্দ্য সিগারেটে দু-একটা টান দিয়ে আবার সেই নম্বর ডায়াল করল। দেবযানী হ্যালো বলতেই অনিন্দ্য বলল, তুমি টেলিফোনের পাশেই বসে আছ কেন?

আমার ইচ্ছে।

যদি আমার সঙ্গে কথা বলতে না চাও, তাহলে লাইনটা কেটে দিয়ে রিসিভারটা পাশে নামিয়ে রাখো। না হলে আমি বারংবার রিং করব।

টেলিফোনে এ-রকম বিরক্ত করলে পুলিশে খবর দেওয়া যায়।

তা তো যায়ই। কিন্তু পুলিশ আমাকে খুঁজে বার করলেও আমার পক্ষে এখন থানায় যাওয়ার অসুবিধে আছে। কারণ আমার জ্বর হয়েছে, আর কপালের ফুলো জায়গাটায়...

তোমার জ্বর হয়েছে?

হ্যাঁ, খুব বেশি-না অবশ্য। তবে কপালের কাটা জায়গাটায় যদি সেপটিক হয়ে যায়, তাহলে জ্বর আরও বাড়বে।

সেপটিক?

হ্যাঁ। চটি জুতোর ধুলো লেগেছিল তো। রাস্তার ঘোড়ার ইয়ে অনেক সময় জুতোতে লেগে যায়...তবে টিটেনাস যে হয়নি, তা বোঝা গেছে—চব্বিশ ঘণ্টা পার হয়ে গেছে তো।

সেপটিক হলে কী হয়?

পদ্মনাভকে মনে আছে? আমাদের সঙ্গে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ত—দাড়ি কামাবার সময়ে একটা ব্রণ কেটে ফেলে ইরিসিপ্লাস হল, দু-দিনের মধ্যে মারা গেল— সেটাও এক ধরনের সেপটিক।

অনিন্দ্য, তুমি শুধু শুধু আমাকে ভয় দেখাচ্ছো।

তোমাকে ভয় পেতে কে বলেছে? তোমার এতে কী-ই-বা আসে যায়?

এবার অনিন্দ্যই দুম করে ফোনটা রেখে দিল। এতক্ষণ গম্ভীরভাবে কথা বললেও তার মুখে দুষ্টুহাসিটা ঠিক লেগে আছে।

তিন মিনিট বাদে আবার টেলিফোন বেজে উঠতেই তার মুখের হাসিটা অনেকখানি বিস্তৃত হয়ে গেল। বিজয়ীর হাসি।

সে ফোন তুলতেই দেবযানী বলল, অনিন্দ্য তুমি যা বললে তা সত্যি? কপালের ওইটুকু কেটে যাওয়ার জন্যই জ্বর হয়েছে? অন্য কেউ কিছু জানে না তো! শিখাকে জিজ্ঞেস করলাম...

আমি তো আর কারুকে কিছু জানাতে যাইনি...

তবে আমাকে জানালে কেন? আমারই দোষে ব্যাপারটা হয়েছে বলে?

না, তাও নয়...

ইস, আমার কান্না পেয়ে যাচ্ছে। কেন করলাম বোকার মতন। রাগ হলে আমার জ্ঞান থাকে না...তোমার খুব ব্যথা হচ্ছে?

খুব নয়।

আমি কী করি? আমিও কপাটে মাথা ঠুকব, আমার কপালটাও ওরকম কেটে ফেলব?

খবরদার ওসব কোরো না। কপালে যদি দাগ হয়ে যায়! মেয়েদের কপালে দাগ থাকলে বিয়ে হতে চায় না।

না হোক গে। আমার এত খারাপ লাগছে। অনিন্দ্য, তুমি কেন সবসময় আমার পেছনে লাগো বলো তোর তুমি আমাকে অতটা রাগিয়ে দিলে বলেই...আমি কক্ষনো কারুর গায়ে হাত তুলি না...আমার ছোটো ভাই ভন্তু—ও এক-এক সময় এমন কান্ড করে, তবু আমি মারতে পারি না।

আমাকে মেরে বেশ হাতের সুখ হয়েছিল তো?

খবরদার, আর ওকথা বলবে না। অনিন্দ্য, বিশ্বাস করো, আমার খুব কষ্ট হচ্ছে, আমার কোনো ব্যবহারে যদি কেউ কষ্ট পায়–

পলা বলছিল, তুমি নাকি বলেছ, অনিন্দ্যটা মরে গেলেই তুমি খুশি হও।

মুখ দিয়ে একটা ভয়ের শব্দ করল দেবযানী। তারপর দারুণ বিস্ময়ের সঙ্গে বলল, পলা বলেছে এইকথা? আমি কোনোদিন এ-রকম কথা চিন্তাও করি না–ছি ছি ছি, আমি নিজে মরে যেতে পারি তবু অন্য কারুর...

দেবযানীর অস্পষ্ট ফোঁপানো কান্না শুনতে পেয়ে অনিন্দ্য একটুখানি চুপ করে থেকে ওকে কাঁদতে দিল। তারপর বলল, পলা তাহলে ভুল শুনেছে। তুমি নাকি কোনোদিন আমাকে ক্ষমা করবে না?

মোটেই ভুল শোনেনি। আমার নামে ইচ্ছে করে বানিয়ে বলেছে। যা ঝুড়িঝুড়ি মিথ্যেকথা বলে। হিংসুটি কিনা এক নম্বরের...

পলা কেন তোমাকে হিংসে করবে?

তা ও-ই জানে। দু-চক্ষে দেখতে পারি না। তুমি জানো না, সেদিন থেকে আমার মনের মধ্যে যে কী ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। আমি বার বার ভাবছি, আমি এত খারাপ হয়ে গেছি। তোমার সঙ্গে তো কথা না বলে চলে আসতেই পারতাম।

জানি, আমাকে দেখলেই তোমার রাগ হয়।

মোটেই না। তুমি সবসময় ইচ্ছে করে আমাকে অপমান কর।

আমি শুধু তোমাকে একবার চুমু খেতে চেয়েছি।

ছিঃ ওইসব কথা কেউ বলে?

আমি কী করব, তোমাকে আমার ভাললা লাগে, তোমার মতন এত সুন্দর মেয়ে আমি কখনো দেখিনি, এত সরল, বিশেষ করে চোখ দুটো এত সুন্দর।

এসব তোমার বানানো কথা।

যদি তাই মনে কর, তাহলে আমি আর কী করতে পারি? আমার কথাবার্তার ধরন একটু কাঠখোট্টা, কিন্তু আমি যে মনে মনে তোমাকে কতখানি...

ওসব কথা থাক।

বলতে দাও। জ্বরটা বাড়ছে মনে হচ্ছে, বেশিক্ষণ কথা বলতে পারব না। তোমাকে শুধু জানিয়ে রাখতে চাই, আমি তোমার একজন ভক্ত। তুমি আমাকে যতই ঘৃণা কর, তবু তোমাকে আমি ভালোবাসব, তোমার চোখ দুটোর কথা ভাবলেই আমার বুকটা কাঁপে..

আমি মোটেই তোমাকে ঘৃণা করি না। শোনো, আমি তোমার সঙ্গে যে খারাপ-ব্যবহার করেছি, সেটা মুছে ফেলার জন্য আমি কী করতে পারি?

একটাই মাত্র কাজ আছে। তুমি এক্ষুনি আমার বাড়িতে চলে আসবে। আমার কপালে জলপট্টি লাগাবে, আমার পাশে বসে থাকবে। আমার ঠোঁটে তুমি চটির ধুলো লাগিয়েছিলে, সেটা আঁচল দিয়ে মুছে দিয়ে সেখানে একটা চুমু দেবে...

প্লিজ, ওইকথা বোলো না।

তুমি আমাকে দেখতে আসতে চাও-না?

তোমার জ্বর হয়েছে, তোমাকে দেখতে যেতে পারি নিশ্চয়ই, কিন্তু ওইসব কথা যদি বল–

ঠিক আছে, তাহলে আসতে হবে না।

আমি সে-কথা বলিনি।

তাহলে চলে এসো এক্ষুনি।

আজ? কিন্তু আজ যে আমাদের বাড়িতে অনেক লোকজন আসবে, তাদের সঙ্গে বেরোবার কথা আছে আমার।

বুঝতে পেরেছি, তুমি কাটিয়ে দিচ্ছ। তোমার বাড়ি তো আমার বাড়ি থেকে বেশি দূরে নয়

বিশ্বাস করো, আজ সত্যি উপায় নেই। আগে থেকে কথা দেওয়া আছে, এরমধ্যে আমি যদি বেরিয়ে যাই, খুব খোঁজাখুঁজি হবে। দিদির কাছে বকুনি খাব। কালকে যাব, কথা দিচ্ছি, কাল তোমায় দেখতে যাব।

ঠিক?

হ্যাঁ। বললাম তো কথা দিচ্ছি।

হ্যাঁ।

দুপুর বেলা ঠিক এই সময়ে?

কিন্তু কাল যদি আমার জ্বরটা আরও বাড়ে? হয়তো আমি অজ্ঞান হয়ে থাকব, তোমাকে। চিনতেই পারব না।

না, না, বাড়বে না। আমি তোমার জন্য প্রার্থনা করব। জানো তো, আমি ঠাকুরে বিশ্বাস করি।

তুমি যে-ঘরে বসে ফোন করছ, সেখানে আর কেউ আছে?

না। কেন?

তুমি ঠাকুরের কাছে যত ইচ্ছে প্রার্থনা করো। মোটকথা কাল তোমাকে আসতেই হবে। আর, এখন আমাকে একটা চুমু দাও। টেলিফোনেই।

ওই কথাটা শুনলেই আমার লজ্জা করে–

লজ্জার কী আছে? রিসিভারে মুখ লাগাও। মনে করো, আমার ঠোঁটের ওপর তোমার ঠোঁট, তারপর?

উঁ, না, অনিন্দ্য পারব না আমি।

তোমার অত সুন্দর ঠোঁট, কেন পারবে না?

একবার কিন্তু।

হ্যাঁ একবার।

টেলিফোনটা রেখে দিয়ে অনিন্দ্য একলা ঘরের মধ্যে নাচতে লাগল। কোমর বেঁকিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ভাংড়া নাচ নেচে বেরিয়ে এল বাইরে। সিঁড়িতে একটা কাগজ পড়েছিল। সেটাতে ফুটবলের মতন শট করল। তারপর সেটাকে মারতে মারতেই নেমে এল নীচে।

প্রফুল্লভাবে শিস দিতে দিতে সে ইলেকট্রিকের তারটা লাগাতে শুরু করল আবার। কাজটা সমাপ্ত হলে সে ভাঁড়ারঘরের জানলার দিকে তাকাল।

চোরটা জানলার শিক ধরে একদৃষ্টে চেয়ে আছে তার দিকে। অনিন্দ্যর মনে হল, আজ পৃথিবীতে কোনো মানুষের বন্দি থাকা উচিত নয়।

দরজার শিকলটা খুলে দিয়ে সে বলল, এই, বেরিয়ে আয়।

চোরটা তবু বেরোতে সাহস করছে না।

অনিন্দ্য ঘরের মধ্যে ঢুকে ছেলেটার ঘাড় ধরে বাইরে নিয়ে এল। নতুন করে আবার মার খাওয়ার জন্য ছেলেটার শরীর কুঁকড়ে আছে। তার চোখের নীচে শুকনো জলের দাগ।

অনিন্দ্য তাকে সদর দরজার দিকে এক ধাক্কা দিয়ে বললে, যা। পালা!

বাইরে থেকে রঘু সহায় তক্ষুনি ঢুকল। সে ছেলেটাকে প্রায় খপ করে লুফে নিয়ে বলল, কেয়া ভাগতা হ্যায়। রঘু সহায় তার চুলের মুঠি ধরতেই অনিন্দ্য বলল, ছেড়ে দাও? হাওয়ায় শার্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে সে চার টাকা তিরিশ পয়সা বার করে আনল। ছেলেটার হাতে সেগুলো খুঁজে দিয়ে বলল, যা ভাগ। চুরি যদি করতে হয়, অন্য পাড়ায় করবি। ফের এ-পাড়ায় এলে ঠ্যাং খোঁড়া করে দেব।

১৭. সঞ্জয় অনেক জিনিসপত্তর এনেছে

সঞ্জয় অনেক জিনিসপত্তর এনেছে। এক ঝুড়ি আম, এক হাঁড়ি খোয়া ক্ষীর এবং শাশুড়ির জন্য তসরের শাড়ি। নিজে বুঝে-শুনে কেনাকাটি করে এত জিনিসপত্তর সে আগে কখনো আনেনি।

শাশুড়িকে প্রণাম করে সে সকলের খবর-টবর নিল। তারপর মণিকে জিজ্ঞেস করল, তোদের টিকিট কাটা হয়ে গেছে?

মণি বলল, না। দাদু এসে কেটে দেবেন বলেছেন।

ঠিক আছে, সেজন্য আর ব্যস্ত হতে হবে না। আমিই ব্যবস্থা করব।

তাঁরা ঠিক খেয়ে ওঠার পরই সঞ্জয় এসেছে বলে নিভা দারুণ লজ্জায় পড়েছেন। সঞ্জয় রেলের ডাইনিং কারে লাঞ্চ খেয়ে এসেছে শুনেও তিনি নিবৃত্ত হলেন না, তক্ষুনি তার জন্য রুটি করতে বসলেন আবার। বাড়িতে ঘি নেই, ডালডার লুচি জামাইকে খাওয়ানো যায় না।

প্রায় ঘণ্টা খানেক পরে বাসন্তী তার স্বামীর সঙ্গে নিভৃতে কথা বলার সুযোগ পেল। ছোটো মেয়েটা ঘুমিয়েছে; মণি ছোটোমামার ঘরে চলে গেছে। মাকেও জোর করে পাঠানো হয়েছে। বিশ্রাম করতে।

বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছে সঞ্জয়। বাসন্তী একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইল। আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করল, তুমি হঠাৎ চলে এলে যে?

সঞ্জয় হাসিমুখে বলল, হঠাৎ তোমাদের দেখতে ইচ্ছে করল। মাঝে মাঝে মন কেমন করে না?

বাসন্তী চুপ করে রইল। সে জানে, একথা সত্যি নয়।

সঞ্জয় বিছানায় চাপড় মেরে বলল, এখানে এসে বোসো!

বাসন্তী বসল। আড়ষ্ট। বুকের মধ্যে একটা বাষ্পের মতন জিনিস ঘুরে ঘুরে উঠছে, গলার কাছে এসে জমাট বাঁধছে। এই উৎকণ্ঠা ক্রমশ বাড়তেই থাকবে।

বাসন্তীর কোমর ও পেটে হাত বুলোতে বুলোতে সঞ্জয় বলল, তোমাদের জন্য একটা সুখবর এনেছি।

বাসন্তী আরও ভয় পেয়ে গেল। সুখবর মানেই তো সঞ্জয়ের আরও উন্নতি!

কী?

বলব, বলব! দাঁড়াও, একটু বিশ্রাম করে নিই। দরজাটা বন্ধ করে দেবে না?

বাসন্তী শিউরে উঠে বলল, পাশের ঘরে মা রয়েছেন না?

তাতে কী হয়েছে?

না, না, দিনের বেলা আমি দরজা বন্ধ করতে পারব না। তা ছাড়া মেয়েটা যদি জেগে ওঠে!

সঞ্জয় বাসন্তীর কাঁধ ধরে আকর্ষণ করে হাসতে হাসতে বলল, কিছু হবে না! একদিনে তোমার কিন্তু শরীরটা বেশ ভালো হয়েছে।

ইদানীং সঞ্জয়ের প্রবৃত্তিবেগ যখন-তখন আসে। আগে সে ছিল শান্ত ধরনের স্বামী এবং স্ত্রীর কাছেও লাজুক। আজকাল নতুন জীবিকা নিয়ে সে অনেক ছটফটে হয়েছে, বাসন্তীর সঙ্গে প্রায় প্রেমিকের মতন ব্যবহার করতে চায়, যখন-তখন বাসন্তীর রূপের প্রশংসা করে। বাসন্তী তবুও খুশি হতে পারে না। মনে হয়, এর কিছুই স্বাভাবিক নয়।

বাসন্তী নিজের শরীরটাকে আলাদা করে সঞ্জয়ের সেবা করতে লাগল। স্ত্রী হিসেবে তার যতখানি করা উচিত।

কিছুক্ষণ বাদে সঞ্জয় বলল, তোমার বাবা কোথায় গেছেন?

বাসন্তী বলল, ওই যে ওঁর এক বন্ধুর আশ্রমে, যেখানে প্রায়ই যান।

ওঁর সঙ্গে আমার দরকারি কথা আছে।

তুমি আমাকে কী খবর দেবে বলছিলে?

বলছি, বলছি, ব্যস্ত হচ্ছ কেন?

দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে রাখা সঞ্জয়ের মস্ত সুটকেস। দু-দিনের জন্য যে এসেছে, তার সঙ্গে অত বড়ো সুটকেস কেন? বাসন্তী সেই কথাটাই এবার জিজ্ঞেস না করে পারল না।

সঞ্জয় গম্ভীরভাবে বলল, দরকার আছে। কলকাতায় অনেক কেনাকাটি আছে আমার।

আমরা শনিবারেই ফিরছি তো?

দেখি। কেন, এখানে আর ভালো লাগছে না?

ভালো লাগবে না কেন? খুবই ভালো লাগছে। মণি, খুকু, ওরাও খুব আনন্দে আছে। কিন্তু তোমার তো অসুবিধে হচ্ছে ওখানে।

আমার আর কী অসুবিধে!

তুমি কি বেশিদিনের ছুটি নিয়ে এসেছ?

...ছুটি? আমাকে আর কে ছুটি দেয়? শোনো, তোমাকে যে-কথাটা বলব বলছিলাম—আর চেপে রাখা গেল না। আমি ভাবছি, মুনশিগঞ্জের পাট একেবারেই তুলে দেব। তোমরা এখন থেকে কলকাতাতেই থাকবে। কি, খুশি তো?

বাসন্তীর মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেল। কথাটার মানেই ঠিক বুঝতে পারল না সে। সঞ্জয়ের এটা কি নতুন একটা চাল?

সঞ্জয় বাসন্তীর বুকের ওপর মুখ এনে বলল, মুনশিগঞ্জে আর থাকার কোনো মানে হয় না। কলকাতাতেই একটা বাড়ি ভাড়া করব। ছেলে-মেয়ে দুটোর লেখাপড়াও ওখানে কিছু হত না। এখানে ভালো স্কুলে ভরতি হয়ে যাবে এ-বছরেই। ছোটকুটার একটা চাকরির ব্যবস্থা করেছি পাটনায়। মা এখন ওর কাছেই থাকবে। ব্যবস্থাটা তোমার পছন্দ হচ্ছে না?

বাসন্তী সব কিছু ভুলে গেল। তার মনে হল, চন্দনের গন্ধমাখা বাতাস বইছে পৃথিবীতে। সঞ্জয় আবার বদলে গেছে। সে ফিরে আসছে সংসারে। মুনশিগঞ্জের কয়েকটা বছরের দুঃস্বপ্ন মিলিয়ে গেল। সঞ্জয় এখানে যেকোনো একটা চাকরি বা ছোটোখাটো ব্যাবসা যা-খুশি করুক, তাতেই সে সুখী হবে। সে আবার ফিরে পাচ্ছে ছোট্ট একটা জিনিস, যার নাম শান্তি। তার শরীরের তাপ এসে গেল। সে এবার সঞ্জয়ের পাশে শুয়ে পড়ে বলল, সত্যি? এসব সত্যি বলছ?

বাসন্তীর এই সুখটুকু কয়েকটি মুহূর্তের জন্য মাত্র। স্ত্রীর মুখচুম্বন সমাপ্ত করে সঞ্জয় বলল, সত্যি নাকি মিথ্যে বলছি? মুনশিগঞ্জে শুধু আমার ছোট্ট একটা অফিস থাকবে। তোমাদের নিয়ে সেখানে বাস করা এখন আমার পক্ষে রিস্কি। আমি এখানে একলা থাকব-মাসে দু তিনবার তোমাদের কাছে আসব অবশ্য।

তুমি ওখানে থাকবে?

না-হলে আমার ব্যাবসা দেখবে কে?

দরকার নেই ওই ছাইয়ের ব্যাবসার। তুমি সব ছেড়ে দাও।

বোকার মতন কথা বোলো না। সবে জিনিসটা তৈরি করছি, এখন সব ছেড়ে দেব? এ কি মুখের কথা?

তাহলে আমরা কলকাতায় থাকব কেন? আমরাও ওখানেই থাকব।

তা হয় না! হঠাৎ জাভেরির বাড়ি সার্চ হয়েছে। যেকোনোদিন আমার বাড়িতেও আসতে পারে। যাদের ঘর-সংসার আছে, তাদের ওপর নজর রাখা সহজ।

শোনো, শুধু ব্যাবসা করলে পুলিশ বাড়ি সার্চ করবে কেন?

সে তুমি বুঝবে না।

তাহলে আমিও তোমার সঙ্গে মুনশিগঞ্জেই থাকব। কিছুতেই আমি দূরে থাকতে পারব না।

বলছি তো সেটা হয় না। কলকাতায় মা-বাবার কাছে থাকবে, সেটা পছন্দ হল না? প্রায়ই তো বাপের বাড়ি আসবার জন্য নাকেকান্না কাঁদো।

বাসন্তী চুপ করে গেল। সঞ্জয়ের মেজাজ চড়তে শুরু করলে, সে বড় জোরে জোরে কথা বলে। পাশের ঘরে মা আছেন। তার আর এখন উৎকণ্ঠা নেই, এখন একটা স্পষ্ট ভয়ে তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে। সঞ্জয় সত্যিই কী চায়?

আবার উঠে বসে সে বলল, কলকাতায় আমরা কোথায় থাকব?

একটা বাড়ি-টাড়ি দেখতে হবে। কলকাতায় বাড়ি পাওয়া অবশ্য সহজ নয়। আমি তো ভাবছিলাম, তোমরা এইখানেই তো থেকে যেতে পার। মণীশ নেই, তার ঘরটা তো ফাঁকাই রয়েছে। তোমরা দিব্যি থাকতে পারবে। অন্য জায়গায় ঘর ভাড়া নিলে তোমাদের দেখাশুনো কে করবে, সেও তো একটা কথা। তোমার বাবার সঙ্গে এই নিয়ে একটা কথা বলব ভাবছিলাম।

তার মানে, আমার বাবার ঘাড়ের ওপর চাপব?

কেন? আমি তোমাদের খরচ দেব।

বাবা কক্ষনো তোমার কাছ থেকে টাকা নেবেন না।

নেবেন না মানে? তোমরা এসে এক সপ্তাহ বা এক মাস রইলে—সে তো মেয়ের জন্য সব বাবা-মা-ই করে, কিন্তু যদি পাকাপাকি একটা ব্যবস্থা হয়, সে অ্যারেঞ্জমেন্ট আমি করব। সেইজন্যই তো ওনার সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই।

আমার বাবাকে তুমি চেন না।

খুব চিনি। বা

বাকে একথা বললেই বাবা জানতে চাইবেন, মুনশিগঞ্জে তোমার একা থাকার কী এমন। দরকার। তুমি তাঁকে বোঝাতে পারবে?

কেন পারব না, উনি তো ছেলেমানুষ নন।

তুমি তো আমাকেই এখনও বোঝাতে পারছ না।

দেখো, বেশি বাজেকথা বোললা না। তোমার বাবা তো আর দু-তিন বছর বাদেই রিটায়ার করবেন। তখন এই সংসারটা চালাবে কে? মণীশটা তো কুলাঙ্গার। সুব্রতও এখনও মানুষ হল। আমাকেই তখন দেখতে হবে। আমি যদি তোমাদের খরচ বাবদ একটু বেশি করে টাকা দিই।

তার মানে, তুমি আমাদের ফেলে যাচ্ছ।

কী?

বাসন্তী ভূত দেখার মতন চোখে তার স্বামীর দিকে তাকিয়ে রইল। এবার সে তার স্বামীকে চিনতে পেরেছে। এবার সে বুঝতে পেরেছে এইসব কথার মানে। সে বিড়বিড় করে আবার বলল, তার মানে, তুমি আমাদের এখানে ফেলে রেখে চলে যেতে চাও–

কী বলছ কী?

-তুমি যদি আর কখনো ফিরে না আস?

সঞ্জয় এইকথায় রীতিমতন আহত বোধ করল। যদিও বাসন্তীর চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে কিন্তু সেদিকে হ্রুক্ষেপ না করে সে বলল, তুমি এই কথা বলতে পারলে আমাকে? তোমাদের ভালোর জন্য আমি এত খেটে খেটে মুখের রক্ত তুলছি, আর তুমি ভাবলে– মেয়েছেলেরা এ-রকমই অকৃতজ্ঞই হয়!

ক্রুদ্ধভাবে সে খাট থেকে নেমে এসে গজরাতে গজরাতে বলল, আমি তোমাদের ফেলে রেখে যাব? আমি কি ঠক না জোচ্চোর যে তুমি আমার সম্পর্কে এইকথা ভাব?

নিজেই সে দরজাটায় ছিটকিনি তুলে দিয়ে এল। তারপর গেঞ্জির তলায় পইতের সঙ্গে বাঁধা চাবি বের করে সে সুটকেশটা খুলল। ঝপাং করে ডালাটা তুলে সে ওপরের জামাকাপড় ছুড়ে ফেলতে লাগল এদিকে-ওদিকে। তারপর বলল, দেখো, দেখে যাও। তোমাদের যদি ফেলেই চলে যেতে চাই, তাহলে এগুলো এনেছি কেন?

সুটকেসের নিচে থরে থরে টাকার নোট সাজানো। শুধু সেগুলো দেখিয়েই সে ক্ষান্ত হল না। মণির ইস্কুলের জ্যামিতির ইনস্ট্রমেন্ট বক্সটাও সেখানে রয়েছে। সেটাও খুলে দেখালো সঞ্জয়। বাক্সটায় ভরতি করা আছে কতকগুলো ম্যাড়মেড়ে হলদে রঙের শলাকা।

সঞ্জয় বাক্সটা বাসন্তীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, এই দেখো সোনার বাট, এর কত দাম হবে জানো?

বাসন্তীর কান্না থেমে গেছে। বিহ্বলভাবে সে বলল, এগুলো কোথায় রাখবে?

কেন, এই বাড়িতে। এখনও আমাকে বিশ্বাস করতে পারছ না?

সেজন্য নয়–

বাসন্তী সঞ্জয়ের পায়ের কাছে বসে পড়ে বলল, ওগো, তুমি এ সব কিছু ছেড়ে দাও। আমাদের এসব কিছু চাই না। আমাদের এবাড়ি সেরকম নয়। আমরা না-হয় আধপেটা খেয়ে থাকব, তবু তুমি এসব ছেড়ে দাও।

বাসন্তী হিস্টিরিয়া রুগির মতন সঞ্জয়ের পায়ে মাথা ঠুকতে যেতেই সঞ্জয় তাড়াতাড়ি নীচু হয়ে তাকে ধরে বলল, কী পাগলের মতন করছ, পাশের ঘরে তোমার মা–

ছোটো মেয়েটা এইসব গোলমালে জেগে উঠল। তার ধারণা হল, বাবা আর মা বুঝি মারামারি করছে। সে ভয় পেয়ে হাউমাউ করে কেঁদে উঠে মা মা বলতে লাগল।

সঞ্জয় কোলে তুলে নিল মেয়েকে। স্নেহময় পিতার মতন তাকে নিয়ে আদর করতে করতে ভোলাতে লাগল। এই দেখো, বাবা এসেছে, বাবা, তুমি ঘুমিয়ে ছিলে মামণি, তোমার জন্য চকলেট এনেছি–

বাসন্তী হাঁটুর ওপর থুতনি দিয়ে বসে আছে। চোখ দুটো ভাসা ভাসা। তার মনে পড়ছে, যদি বাবা এত অল্পবয়সে বিয়ে না দিতেন, যদি দুটো ছেলে-মেয়ে না হয়ে যেত, তাহলে সে এখন নিজের মতামত নিয়ে উঠে দাঁড়াতে পারত। সঞ্জয়কে তার এখন সম্পূর্ণ একজন অচেনা মানুষ মনে হচ্ছে। তবু এর কথা মতনই তাকে চলতে হবে। সঞ্জয় যদি রাগ করে চলে যায়, সত্যিই যদি আর ফিরে না আসে, তাহলে দুটো ছেলে-মেয়ে নিয়ে সে কোথায় দাঁড়াবে?

সঞ্জয় একসময় তার বাবাকে দারুণ ভক্তি করত। কথায় কথায় বাসন্তীকে বলত, তোমার বাবা তো দেবতার মতন মানুষ, এ যুগে ওরকম লোক দেখা যায় না। মণীশ যখন বাড়ি ছেড়ে চলে যায়, তখন সঞ্জয় বলেছিল, তুমি কোনো চিন্তা কোরো না। আমি তো আছি!

তোমার বাবাকে আমি কোনোদিন অসুবিধেয় পড়তে দেব না। আমি যদি না খেয়েও থাকি, তবু আমি ওঁর পাশে গিয়ে যেকোনো বিপদের সময় দাঁড়াব।...এখন সেই সঞ্জয় তার বাবাকে ঘুষ দিতে চাইছে। এবাড়িতে বেআইনি জিনিস লুকিয়ে রাখতে চায়। বাসন্তী তো একথা কারুকে বলতেও পারবে না। বাবা কিছু জানতে পারলেই এমন চেঁচামেচি করবেন যে, তাতে বিপদ আরও বাড়বে। চোখ দিয়ে তার টপটপ করে জল পড়তে লাগল।

মেয়েকে একটু শান্ত করে সঞ্জয় তাকে শুইয়ে দিল খাটের ওপর। তারপর বাসন্তীর সামনে এসে গাঢ়গলায় বলল, তোমাকে কিছু চিন্তা করতে হবে না। তোমার বাবার সঙ্গে আমিই যা বলার বলব। আমার কাজ-কারবারের জন্য তোমার বাবার সাহায্য এখন আমার বিশেষ দরকার। উনি তো আমারও বাবার মতন।

১৮. হোটেল থেকে ফিরে আসতে হল ভাস্করকে

পরপর দু-দিন মণীশের হোটেল থেকে ফিরে আসতে হল ভাস্করকে। মণীশ কোথায় যায় কে জানে! দুপুরে তাকে টেলিফোনেও পাওয়া যায় না। অথচ সে হোটেল ছাড়েনি, কলকাতাতেই আছে।

ভাস্কর একবার বিরক্ত হয়ে ভেবেছিল, আর সে আসবেই না খোঁজ নিতে। মণীশের যদি কোনো উৎসাহ না থাকে তো সে কেন দেখা করবার জন্য এত ব্যস্ত হবে!

ইন্দ্রাণীর সঙ্গেও মণীশ কোনো যোগাযোগ করেনি। এই ব্যাপারটা খুব সন্তর্পণে জানতে হয়েছে। কারণ ইন্দ্রাণী যদি শোনে, মণীশ কলকাতায় এসেও একবারও খোঁজ করেনি তার, তাহলে হয়তো সে নতুন করে আঘাত পাবে। কিংবা, ইন্দ্রাণীর মনটা বোঝা যায় না সহজে, সে এত বেশি চাপা।

মা-বাবা ফিরে এসেছেন। ভাস্করের বাড়ি এখন ফাঁকা নয়। সন্ধ্যে বেলা সে ছবি আঁকার সরঞ্জাম নিয়ে বসেছিল। একসময় সে রং ও রেখার জগতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আশ্রয় নিতে পারত। যদি আবার সেই জগতে ফিরে যাওয়া যেত। নিজের ছবি দেখে তার নিজেরই এখন হাসি পায়। লাইনগুলোর মধ্যে কোনো জোর নেই। খেলাচ্ছলে ভাস্কর একটা দানবের মুখ আঁকতে লাগল।

রাত দশটার সময় ভাস্কর আবার চলে এল মণীশের হোটেলে। এবার তাকে পাওয়া গেল। একতলার বারে সে তিন-চারজন অচেনা লোকের সঙ্গে জমিয়ে বসেছে। ভাস্করকে দেখে সে উৎফুল্লভাবে বলল, এসেছিস? আয়, মাল খাবি আয়।

মণীশের চোখ দুটো লাল, চুলগুলো খাড়াখাড়া, জামার বুকের বোতামগুলো সব খোলা। অনেক মাতালের চেহারাতেই একটা নকল বীরত্বব্যঞ্জক ভাব থাকে, মণীশকেও সেইরকম দেখাচ্ছে। জ্বলজ্বলে চোখ, রুক্ষ কণ্ঠস্বর।

কী খাবি? এতক্ষণ কী খাচ্ছিলি?

প্রতিবাদ করে লাভ নেই, তাই ভাস্কর বলল, একটা বিয়ার।

এতরাত্রে বিয়ার? সর্দি লেগে যাবে রে, হুইস্কি খা। আমার গেলাস থেকে একটা চুমুক দে ততক্ষণ।

দু-দিন এসে তোর দেখা পাইনি।

–কাজের ধান্দায় ঘুরছিলাম। যদি এখানে কিছু বিজনেস পাওয়া যায়!

ভাস্করের মনে হল, সে এখানে এসে পড়ে ভুল করেছে। চারদিকে মাতালের হল্লা। এখানে মণীশের সঙ্গে কোনো কথাও বলা যাবে না।

ভাস্কর আস্তে আস্তে বিয়ারে চুমুক দিচ্ছে, মণীশের সেটা পছন্দ হল না। সে বলল, কী খাচ্ছিস, অ্যাঁ? নে, একটু স্ট্রং করে দিচ্ছি।

দিল সেই বিয়ারের মধ্যে হুইস্কি মিশিয়ে। জিনিসটা বিস্বাদ হয়ে গেল। তা ছাড়া ভাস্করকে মোটরবাইক চালিয়ে ফিরতে হবে বাড়িতে।

এক্ষুনি বার বন্ধ হয়ে যাবে, ঘণ্টা দিচ্ছে। সকলের জন্য আর একটা করে পানীয় জল নিয়ে মণীশ চেঁচিয়ে বলল, বিল লাও।

টেবিলের সব বিল সে একা দেবে। প্রায় দেড়-শো টাকার মতন। মণীশ তার ব্যাগ খুলল, তারমধ্যে চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকার বেশি নেই। সে ফিক করে হেসে চুপি চুপি ভাস্করকে বলল, সব টাকা ফুরিয়ে গেছে, জানিস তো! কোই বাত নেহি!

কলম চেয়ে ঘস ঘস করে সই করে দিল বিলগুলোতে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চল ভাস্কর, ওপরে আমার ঘরে চল।

আর একজনের দিকে তাকিয়ে বলল, পন্ডিত, একটা বোতল যোগাড় করো-না!

ভাস্কর আর থাকতে চায় না, কিন্তু মণীশ তাকে ছাড়বে না। অন্য লোকগুলোও জুটে গেল বলে ভাস্করের আরও বেশি খারাপ লাগছে। লোকগুলোর আর কোনো পরিচয় আছে বলে মনে হল না, তারা শুধুই মাতাল। চারতলায় মণীশের ঘরে দু-টি মাত্র চেয়ার, বাকিরা বসেছে বিছানায়, অনবরত গেলাসে ঢালাঢলি হচ্ছে, আর জিনিসপত্রের দাম, কলকাতার কোনো হোটেল কীরকম এইসব এলোমেলো কথা।

রাত বেড়ে যাচ্ছে। ভাস্কর জানে, সে বাড়ি না-ফেরা পর্যন্ত তার বাবা-মা দুজনেই জেগে থাকবেন। এই একটা বিশ্রী ব্যাপার। অথচ মণীশ তাকে কিছুতেই যেতে দেবে না। জোর করে হাতটা ধরে আছে।

মণীশের মদ খাওয়া দেখলে শিউরে উঠতে হয়। অ্যালকোহল রক্তের সঙ্গে মিশবার সময়টুকুও দিচ্ছে না। একটা পুরো গেলাস এক চুমুকে শেষ করে ঠক করে গেলাসটা নামিয়ে রাখছে। এটা নেশা নয়, এক ধরনের পাগলামি, ভাস্কর জানে।

একবার বাথরুমে যেতে গিয়ে মণীশ দরজার সঙ্গে দারুণভাবে ধাক্কা খেল। অন্য লোকগুলো ইস করে উঠলেও ভাস্করের মায়া হল না। মণীশ শেষ হয়ে গেছে। যে-মণীশ তার বন্ধু ছিল, সে আর নেই। ওর পক্ষে শিলং-এ ফিরে যাওয়াই এখন ভালো।

মণীশ, আমাকে এখন যেতেই হবে।

দাঁড়া, তুই কি ভাবছিস আমার নেশা হয়েছে? দেখবি, এখনও কীরকম বডি ফিট আছে? শীর্ষাসন করতে পারি।

মণীশ সত্যিই মাটিতে শুয়ে পড়ে ডিগবাজি খেয়ে পা দুটো দেওয়ালে ঠেকিয়ে রাখল। মুখটা টকটকে লাল। সেই অবস্থায় বলল, কতক্ষণ থাকব, বল?

ভাস্কর তার পা দুটো ধরে নামিয়ে দিয়ে বলল, তুই এবার শুয়ে পড়। রাত্তিরে কিছু খাবি নিশ্চয়ই।

মণীশ আবার সদর্পে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, আমি এখন বেরোবো।

কোথায় যাবি?

ঘুরে আসি একটু! তোর সঙ্গেই যাব।

আমার সঙ্গে যেতে পারবি না, আমি তো মোটরসাইকেলে–

–আলবাত পারব।

অন্য লোকগুলো ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার পর মণীশ তালা লাগালো। তারপর একজনকে বলল, পন্ডিত, আমার ক্যামেরাটা দেখেছ তো? একটা খদ্দের দেখো তো! ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ লেন্স, হাজার দেড়েক পেলেই ঝেড়ে দেব। আর এই ঘড়িটা, সিকো–এটারও খদ্দের দেখো।

লিফটের অপেক্ষা না-করে সিঁড়ি দিয়েই নেমে এল সবাই। অন্যদের বিদায় দিয়ে মণীশ চেপে বসল ভাস্করের মোটরসাইকেলের পেছনে। ভাস্কর একেবারেই পছন্দ করছে না। মণীশ নিজেকেই সামলাতে পারছে না, যদি হঠাৎ পড়ে-উড়ে যায়। তা ছাড়া এত রাত্রে মণীশকে নিয়ে সে কোথায় ঘুরবে?

সে দৃঢ়স্বরে বলল, আমি কিন্তু বাড়িতে যাব।

আমাকে রাস্তায় যেকোনো জায়গায় নামিয়ে দিস!

এত রাত্রে শুধু শুধু কোথায় ঘুরবি?

যেখানে ইচ্ছে!

তোর বড়োলোক হওয়ার ব্যাপারটা তা হলে বাজেকথা?

কেন?

বড়োলোকরা ক্যামেরা-ঘড়ি বিক্রি করে হোটেলের বিল শোধ করে না!

হ্যা-হ্যা করে হেসে উঠে মণীশ বলল, তুই ধরে ফেলেছিস! ঠিক ধরেছিস তো মাইরি!

মণীশ ভাস্করের পিঠটা খামচে ধরে আছে। সামান্য একটু ঝাঁকুনিতেই হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। মাঝে মাঝে হেঁচকিও তুলছে খুব জোরে। কতবার্তা জড়িয়ে যাচ্ছে। হাওয়া লেগে ক্রমশই বাড়ছে ওর নেশা।

ততার সঙ্গে আমার অনেক কথা ছিল, কিছুই তো বলা হল না।

হাওয়ার জন্য ঠিক শুনতে পেল না মণীশ। চেঁচিয়ে বলল, অ্যাঁ? কী?

তুই কি রোজ এইরকমভাবেই কাটাবি?

আর কীরকম ভাবে কাটাব?

ইন্দ্রাণীর সঙ্গে সত্যিই দেখা করবি না?

তোকে দিয়ে দিয়েছি তো!

ইন্দ্রাণী কি তোর সম্পত্তি ছিল যে আমাকে দিবি?

তাহলে আবার জিজ্ঞেস করছিস কেন? না রে বাবা, তোরই সম্পত্তি, তুই নে। আমি তো বলেইছি, মেয়েছেলের ব্যাপারে আমার কোনো আগ্রহ নেই!

তুই কোথায় নামবি?

এটা শেক্সপিয়র সরণি না? এখানে একটু দাঁড়া। তোকে একটা জিনিস দেখাই।

কী?

কাল রাত্রে এখানে একটা মেয়েছেলে আমাকে হাতছানি দিয়ে ডেকেছিল। দেখি, আজও সেই মাগীটা আছে কি না!

ভাস্কর নীরসভাবে বলল, তোকে আমি নামিয়ে দিচ্ছি। তোর যত ইচ্ছে দেখ!

মোটরসাইকেলটা থেমেছে। মণীশ বলল, ওই দেখ-না।

আগাছা জঙ্গলে ভরতি একটা মাঠ। তার পাশে ভাঙা দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়ে। অতিরিক্ত পাউডারমাখা মুখ। নীল রঙের শাড়িতে নকল জরির চুমকি বসানো। ওদের দিকেই চেয়ে আছে।

মণীশ বিড়বিড় করে বলল, ইফ আই প্রোফেন উইথ মাই আনওয়ারদিয়েস্ট হ্যাণ্ড দিস হোলি শ্রাইন, দা জেন্টল সিন ইজ দিস। কার কথা বল তো?

ভাস্কর বলল, জানি না। জুলিয়েটকে রোমিয়ো প্রথম এই কথাটা বলেছিল। এই মেয়েটাই কাল আমাকে– তুই কী করতে চাস এখন?

শোন-না! বড্ড ছটফট করিস! কাল আমি এখানে ট্যাক্সির জন্য দাঁড়িয়েছিলাম, এই। মেয়েটা এসে আমার গা ঘেঁষে দাঁড়াল। ভুরু নাচালো আমার দিকে। জানে না তো, ভুল পার্টির কাছে এসেছে। একটা ধমক দিতেই পোঁ-পোঁ করে পালালো। খিস্তিও দিল খানিকটা। নতুন কিছু ব্যাপার নয়। কিন্তু আজই দুপুরের দিকে এদিকে আবার এসেছিলাম,

দেখি যে, ঠিক শেক্সপিয়রের মূর্তির তলায় শুয়ে আছে এই মেয়েটা। দিনের আলো তো, স্পষ্ট দেখলুম, সারা গায়ে একজিমা, ভিডি-র এক্সপোজারও হতে পারে—কী কুৎসিত তুই ভাবতে পারবি না—শেক্সপিয়র একে নিয়ে কিছু লেখেন নি, তাই বুঝি তাঁর পায়ের কাছে শুয়েছিল। এই শোনো-

মণীশ, কী হচ্ছে কী?

--দেখ না! এই শোনো-না এদিকে—

মোটরবাইক থেকে নেমে দাঁড়িয়ে মণীশ সাড়ম্বরে মেয়েটিকে ডাকতে লাগল। তার শরীরটা দুলছে, সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না।

মেয়েটা এগিয়ে এল তার কাছে। তার মুখটা ভালো করে দেখে নিয়ে বলল, এখন কিন্তু মন্দ দেখাচ্ছে না। ভাস্কর, দেখ ভালো করে, ঠিক যেন বিষকন্যা, এক-একজন পুরুষকে বিষ দেবার জন্য দাঁড়িয়ে থাকে। কত রেট?

মেয়েটা বলল, কোথায় যাবে?

মণীশ পকেট থেকে পাঁচ টাকার একটা নোট বার করে তার দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, সি স্পিকস। ও, স্পিক এগেইন ব্রাইট এঞ্জেল!

ভাস্কর মণীশের হাত ধরে টানল। মেয়েটা বলল, এখানে দাঁড়িয়ে থেকো না কোথায় যাবে, বলো না!

মণীশ এবার রুক্ষভাবে বলল, কোথাও যাব না। আঁচলটা খোল, তোর পিঠটা দেখি।

পিঠে কী আবার দেখবে?

মণীশ, কী হচ্ছে কী।

আঁচলটা খোল! পিঠ, বুক সব দেখব। চাকা চাকা ঘা, ভালো করে দেখিস ভাস্কর! অথচ দেখ, সেজেগুজে এখন বেশ ভালোই দেখাচ্ছে। কেউ বুঝতে পারবে? এই তো মেয়েছেলে, সব ভেতরে ঘা।

ভাস্কর গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বলল, আমি চললাম।

মণীশ তার হাত চেপে ধরে বলল, পালাচ্ছিস কেন? তোকে দেখতেই হবে।

মণীশ, আমার হাত ছাড়। কেন তুই আমাকে এ-রকম অপমান করছিস?

অপমান? আমি তোকে কোথায় অপমান করলাম, বাবা! লাও ঠ্যালা! তুই বারবার মেয়েছেলের কথা বলছিলি কিনা, তাই তোকে দেখালাম, মেয়েছেলে কী জিনিস–

এক্ষুনি এখানে পুলিশ-টুলিশ আসবে। একটা বিশ্রী কান্ড হবে।

মণীশ মেয়েটার দিকে ফিরে বলল, যা ভাগ। তোকে মুদ্দোফরাশেও ছোঁবে না। চল ভাস্কর।

তুই এখন কোথায় যেতে চাস?

ইন্দ্রাণীর বাড়িতে।

ভাস্করের মুখে একটা দুঃখের ছাপ পড়ল। এইরকম পরিবেশ, এতরাত্রে ইন্দ্রাণীর নাম মণীশের মুখে এল। ওর আর বিবেক বলে কিছু নেই, মণীশ হাসছে।

আমি এখন আমার বাড়িতে যাচ্ছি।

বেশি রাত হয়নি। চল-না ইন্দ্রাণীর সঙ্গে দেখা করে আসি, তুই এত করে বলছিলি। ওকে কড়কে দিয়ে আসি। কেন ও তোকে বিয়ে করছে না?

পাগলামি করিস না।

চল-না।

আমি তোকে এখানে রেখে যাচ্ছি, তোর যা ইচ্ছে কর।

ঠিক আছে, আমি তাহলে ট্যাক্সি করে যাব।

ভাস্কর সত্যিই গাড়িতে স্টার্ট দিল। খানিকটা দূরে গিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল মণীশ ফুটপাতে বসে পড়েছে। ওকে কি এইরকমভাবে ফেলে রেখে চলে যাওয়া যায়? মহা ঝামেলা!

ভাস্কর আবার ঘুরে এল।

এখানে বসে পড়লি কেন? ওঠ, চল, তোকে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে আসি। মণীশ বলল, তুই ফিরে এলি কেন? তুই কি ভাবছিস, আমার ট্যাক্সিভাড়াও নেই? আমি ইন্দ্রাণীর বাড়িতে যাবই। বলেছি যখন যাবই।

এখন বারোটা দশ বাজে।

তাতে কী হয়েছে? দিনের বেলা যে বাড়িতে যাওয়া যায়, রাত্তিরে সেখানে কেন যাওয়া যাবে না। চোরেরাও রাত্তিরে অন্য লোকের বাড়ি যায়। আর ভদ্রলোকেরা যেতে পারবে না?

মণীশ, তোর পায়ে ধরছি।

তোর এত মাথাব্যথা কেন? তুই যা-না!

হঠাৎ স্প্রিংয়ের পুতুলের মতন উঠে দাঁড়িয়ে মণীশ চেঁচিয়ে উঠল, ট্যাক্সি ট্যাক্সি!

একটা ট্যাক্সি সত্যিই এসে দাঁড়াল। ভাস্কর মণীশের পথ আটকে বলল, তোকে আমি কিছুতেই যেতে দেব না।

মণীশ এক ঝটকায় তাকে সরিয়ে বলল, তুই আমার সঙ্গে গায়ের জোরে পারবি না। কেন বৃথা চেষ্টা করছিস!

ভাস্কর বুঝতে পারছে, মণীশের ক্রমেই নেশা বাড়ছে। তখন ঢক ঢক করে জল খাওয়ার ফল। ওর মাথা এখন আর যুক্তিগ্রাহ্য নেই। সত্যিই হয়তো ইন্দ্রাণীর বাড়িতে চলে যাবে।

টলতে টলতে ট্যাক্সিতে উঠে মণীশ শয়তানের মতন হেসে বলল, দেখ-না, এখন কী কান্ড করি! কাল সকালে খবর নিস ওদের বাড়িতে—চলিয়ে সর্দারজি!

ভাস্কর একবার ভাবল, হয়তো মণীশ এখনও ঠাট্টা করছে তার সঙ্গে। তবু পুরোপুরি বিশ্বাস

হয় না। সে বাড়িতে ফিরতে পারছে না, ট্যাক্সিটাকেই অনুসরণ করতে লাগল। এবং একটু পরেই বুঝতে পারল, মণীশ ঠিক ইন্দ্রাণীদের বাড়ির দিকেই যাচ্ছে।

ভাস্কর তার মোটরবাইকটা ট্যাক্সির সমান্তরালে এনে জানলা দিয়ে বলল, মণীশ, প্লিজ, এ রকম করিস না, তোকে অনুরোধ করছি, আমার শেষ অনুরোধ।

—আমি যাবই।

শান্ত ঘুমন্ত পাড়ায় এসে ট্যাক্সিটা থামল। ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে লটপটে পায়ে মণীশ এগিয়ে গেল ইন্দ্রাণীর বাড়ির দিকে। তারপর দরজার সামনে এসে ওপরের দিকে মুখ করে জড়ানো গলায় চেঁচিয়ে উঠল, ইন্দ্রাণী!

মোটরবাইকের শব্দ এখন ভাস্করের নিজের কানেই খুব বিশ্রী শশানাচ্ছে। স্টার্ট বন্ধ করে সে এগিয়ে গেল মণীশের দিকে। অদ্ভুত বিষণ্ণ হয়ে গেছে মুখখানা। সে বুঝতে পারছে, এসব কিছুই তার নিজের দোষে।

ভাস্করকে দেখে মণীশ আরও জোরে ইন্দ্রাণী বলে চেঁচিয়ে উঠল।

ভাস্কর মৃদু গলায় বলল, এই তো কলিং বেল রয়েছে। চেঁচাবার দরকার কী!

নিজেই সে বেল টিপল।

১৯. উমা বলেছিল, নিশানাথের সঙ্গে কলকাতায় আসবে

উমা বলেছিল, নিশানাথের সঙ্গে কলকাতায় আসবে। শহরে কিছু কেনাকাটা করার আছে, তা ছাড়া ভবানীপুরে তার এক ননদের বাড়ি, সেখানে থেকে আসবে কয়েক দিন। কিন্তু সকাল বেলা সে মত বদলে ফেলল। জীবন ডাক্তার বারবার বললেন, যা না, ঘুরে আয় এক সপ্তাহের জন্য, ভালো লাগবে। নিশানাথও পীড়াপীড়ি করলেন অনেকবার, কিন্তু উমা বলল, থাক, এখন না। হঠাৎ তার এই মত পরিবর্তনের কারণ নিশানাথ বুঝতে পারলেন না। আগের রাত্রে সে নিজেই কত উৎসাহ দেখিয়েছিল।

একদিন অফিস কামাই হয়েছে, আজ নিশানাথকে ফিরতেই হবে। সুব্রতর বেশ জ্বর জ্বর ভাব, জীবন ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করে ওষুধ দিয়েছেন। তিনি নিশানাথকে বললেন, আয়, তোর ব্লাড প্রেসারটাও চেক করে দিই। নিশানাথ রাজি হলেন না। কথাটা উড়িয়ে দিয়ে বললেন, ওসব দেখলেই মনের মধ্যে ভয় ঢোকে। আমি ঠিক আছি।

তারপর হেসে বললেন, আমি হঠাৎ মরলে চলবে কেন? তাহলে এসব দেখবে কে? দেখ না, আমি শিগগিরই এখানে পাকাপাকি চলে আসছি!

ফেরিঘাট মাইল খানেকের রাস্তা। জীবনময় আর উমা ওদের এগিয়ে দিতে এল খানিকটা। উমার পায়ের একটা আঙুলের নখ অনেকখানি উড়ে গেছে আগের রাত্রে হোঁচট খেয়ে, অসহ্য ব্যথা, কিন্তু সে-কথা কারুকে বুঝতে দেয় নি। শুধু রবারের চটি পরেছে আজ।

জীবনময় আর নিশানাথ আগে আগে যাচ্ছেন, পেছনে উমা আর সুব্রত। উমা গল্প জমাবার চেষ্টা করলেও সুব্রত সংক্ষেপে একটা-আধটা উত্তর দেয়। মেয়েদের সামনে সে বেশি লাজুক হয়ে পড়ে।

দূরে আন্দাজগড় এখন স্পষ্ট দেখা যায়, জীবনময় ওইটার বিষয়েই বলছেন নিশানাথকে। নিশানাথ বললেন, সত্যি, এতদিন আসছি, ওটার মধ্যে তো কখনো যাওয়া হয়নি। সামনের সপ্তাহে এসে ঠিকই যাব। ওটা একটু সারিয়ে-টারিয়ে আমরাই যদি দখল করে নিই, তা হলে কী হয়?

জীবনময় বললেন, দখল নেওয়া হয়তো সোজা। কিন্তু দখল টিকিয়ে রাখা শক্ত।

কেন?

দেখাশুনো করবে কে? এমনি এমনি দখল নিলেই তো হল না। ওষুধ ছড়িয়ে সাপ তাড়ানো যায়, কিন্তু ফাঁকাবাড়িতে মানুষ আসবেই।

নিশানাথ উৎসাহের সঙ্গে বলল, আমি যখন এখানে পাকাপাকি চলে আসব তখন আমি ওই দুর্গটাতে থাকব।

জীবনময় হেসে বললেন, তা মন্দ হবে না। তোমাকে দুর্গের অধিপতি হিসেবেই মানায়!

আমি মন ঠিক করে ফেলেছি। আমি এ-রকম খোলা আকাশের নীচে এসেই থাকব।

আমি বেঁচে থাকতে থাকতে আসিস।

নিশানাথ বন্ধুর হাত চেপে ধরে বললেন, জীবন, তুই আর কটা দিন অপেক্ষা কর। আমি এসে পড়লে তোর কাজ অনেক হালকা করে দেব। তোকে আরও অনেকদিন বাঁচতে হবে।

পরিষ্কার আকাশ আজ। বিকেলের পাকা ধানের মতন রোদ লকলক করছে। একটা সরষের খেতের পাশ দিয়ে হেঁটে আসছে ওরা। বাতাসে একটা পাতলা গন্ধ।

ভাটার সময়, জল কমে গেছে। খাড়া নদীর পাড় থেকে ফেরিঘাট অনেক নীচুতে। এখান থেকেই বিদায় নিতে হবে। উমা সুব্রতকে বলল, আমাদের মনে থাকবে তো? আবার আসবে তো?

সুব্রত আলগাভাবে ঘাড় হেলালো। নদী দেখেই তার আবার একটু ভয় ভয় করছে। এবার ফিরে গিয়েই সাঁতারটা শিখে নিতে হবে।

নিশানাথ উমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি গেলে না তাহলে? এখনও বলো–

না। পরের সপ্তাহে যাব। আপনি সামনের রবিবার আসছেন তো?

কোন রবিবার না আসি? বছরে ক-টা রবিবার বাদ যায়?

উমা পাশের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, কী জানি, তবু প্রত্যেকবারই মনে হয়, আবার ক দিন পর আসবেন, তার যেন ঠিক নেই। নদী পেরিয়ে আসা তো!

আমি এবার একেবারেই চলে আসব। নদী পেরোতে হবে না আর।

কথাটা বলতে বলতে নিশানাথ বক্রভাবে ছেলের দিকে তাকালেন। তারপর আবার বললেন, আর যেই আসুক আর না আসুক–

নৌকো এখুনি ছাড়বে, আর কিছু বলা হল না। নিশানাথ ছেলেকে নিয়ে নৌকোয় উঠলেন। এটা বেশ বড়োনৌকো, আরও আট-দশ জন যাত্রী রয়েছে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত জীবনময় আর উমাকে দেখা গেল। জীবনময়ের রোগা লম্বা চেহারা। তার পাশে উমা হাত দিয়ে চুল সামলাচ্ছে। নিশানাথ একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেললেন।

খানিক দূরে আসার পর সুব্রতর ভয় অনেক কমে গেল। বাতাস খুব মনোরম। নদীর জল শান্ত গম্ভীর। এখন গঙ্গাকে এয়ারপোর্টের রানওয়ের মতন মসৃণ মনে হয়। সঙ্গে এত লোকজন থাকলে বেশি ভরসা পাওয়া যায়।

নিশানাথ নৌকোয় মাঝিদের কাছে নাসিরুদ্দিনের খোঁজ করছেন। কেউ তার খবর বলতে পারে না। এপারে পৌঁছেও তিনি নাসিরুদ্দিনের নৌকোটা খুঁজে বার করার চেষ্টা করলেন। সন্ধান পাওয়া গেল না। তিনি ঠিক করলেন, পরের সপ্তাহে এসে ঠিক খুঁজে বার করবেন, আজ আর বেশি দেরি করা যায় না, সন্ধ্যের আগে বড়োরাস্তায় পৌঁছোতে না পারলে ডায়মণ্ড হারবারের বাস বন্ধ হয়ে যাবে।

দু-জনে হাঁটাপথ ধরলেন। সুব্রতর ইচ্ছে ছিল একটু চা খাওয়ার। কাল থেকে একটাও সিগারেট খায়নি। কতক্ষণে কলকাতার পৌঁছোবে, এইজন্য তার ভেতরটাতে আকুলবিকুলি করছে।

সরু কাঁচা রাস্তা, তবু এরমধ্যেই উলটো দিক থেকে একটা লরি ছুটে এল। অবিশ্বাস্যরকম দ্রুতগতিতে। আর একটু অন্যমনস্ক থাকলেই লরিটা পিতা-পুত্রকে একসঙ্গে চাপা দিয়ে চলে যেত। শেষমুহূর্তেও লরিটা গতি কমাল না বলে ওরা দুজনেই দৌড়ে একেবারে পাশের মাঠের মধ্যে নেমে পড়লেন। নিশানাথ চিৎকার করে বললেন, বেকুব? হারামজাদা!

তারপর ফের ওপরে এসে এমন আস্ফালন করতে লাগলেন যেন আর একটু সময় পেলেই তিনি লরিটাকে টেনে থামাতেন।

লরির আওয়াজটা মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা বিকট আওয়াজ শোনা গেল সামনের দিক থেকে। কোনো একটা পশুর মোটা চিৎকারে আকাশ খানখান হয়ে যাচ্ছে।

নিশানাথ বিস্মিতভাবে ছেলের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, চল তো দেখি কী হয়েছে–

দু-জনে দৌড়ে এসে সামনের বাঁকটা ঘুরতেই একটা বীভৎস দৃশ্য দেখতে পেলেন। একটা বাঁশবোঝাই গোরুর গাড়ি উলটে পড়ে গেছে রাস্তার পাশে। পলাতক লরিটা হয় এটাকে

ধাক্কা দিয়েছে কিংবা এটার হাত থেকে বাঁচাবার জন্য নীচের দিকে নামতে গিয়ে গাড়িটা উলটে গেছে।

গাড়িটা কাঁচা বাঁশে বোঝাই, এমনভাবে উলটে গেছে যে একটা গোরু চাপা পড়েছে তার নীচে। এই অবস্থায় অন্য গোরুটার শূন্যে ঝুলে থাকা উচিত ছিল, কিন্তু কোনোক্রমে দড়ি ছিঁড়ে সেটা বেঁচে গেছে। গাড়ির চালক বোধ হয় আগেই লাফিয়ে পড়েছিল, সে লোকটা হাউহাউ করে কাঁদতে কাঁদতে গালাগাল দিচ্ছে অশ্রাব্য ভাষায়। তার সঙ্গী একটা ছোটো ছেলে দাঁড়িয়ে আছে বোকার মতন।

চাপাপড়া গোরুটা আঁ আঁ শব্দে এত জোরে চেঁচাচ্ছে যে মনে হয় সিংহের গলার জোর এরচেয়ে বেশি-না।

নিশানাথ লাফিয়ে সেখানে নেমে পড়ে গাড়োয়ানটাকে ধমক দিয়ে বললেন, আগে গোরুটাকে তোলো!

নিজেই তিনি চাড় দিয়ে গাড়িটাকে তোলবার চেষ্টা করলেন। একটুও নড়াতে পারলেন না। কাঁচা বাঁশ সাংঘাতিক ভারি হয়। তিনি হাঁক দিলেন, খোকন, এদিকে ধরবি আয়। ও কত্তা, তুমি ওই দিকটা ধরো।

তিনজনের চেষ্টাতেও গাড়িটাকে ভোলা গেল না। অন্তত আট-দশজন লোক দরকার। গাড়োয়ানটা রাস্তার ওপর উঠে গিয়ে লোক জড়ো করার জন্য চেঁচাতে লাগল।

গোরুটার মৃত্যু-চিৎকার সহ্য করা যায় না। সেটাকে কোনোক্রমে মুক্ত করার জন্য নিশানাথ মাটিতে শুয়ে পড়লেন। গোরুটার একটা পা সাংঘাতিক খিচোচ্ছে, একবার লাগলে আর রক্ষা নেই। সাবধানে তিনি চাকার কাছটাতে চলে এলেন। মাথার ওপরে খোঁচা খোঁচা বাঁশের আগা। হঠাৎ তাঁর একটা কথা মনে পড়ে গেল। উমা বলেছিল, একটা গোরুর গাড়ি খানায় পড়ে যেতে দেখে তার মনে পড়েছিল নিশানাথের কথা। এইটাই তো

তাঁর কাজ। গাড়িটাকে একটু উঁচু করতে পারলে গোরুটা বোধ হয় এখনও বেরিয়ে যেতে পারে।

বাঁশের ডগাগুলো বাঁচিয়ে তিনি কাঁধের চাড় দিলেন। তবু নড়ে না। নিশানাথ নিজের শরীরের সমস্ত শক্তির সঙ্গে আর অনেকগুলি মানুষের শক্তি যোগ দিতে চাইলেন। মুখে সমস্ত রক্ত এসে গেছে। কারা যেন বাইরে চেঁচাচ্ছে! নিশানাথকে এখন ছাড়লে চলবে না। দাঁতে দাঁত ঘসে যাচ্ছে। আর একটু, হে ভগবান, আর একটু জোর দাও!

গাড়োয়ানের চেঁচামেচিতে কিছু লোক জড়ো হয়ে গেছে। তারা এসে প্রথমে হা-হুতাশের শোরগোল তোলে। সাধারণ ভারতীয়দের মতনই তারা সিদ্ধান্ত নিতে নিতে খানিকটা সময় নষ্ট করে। বাঁশের বোঝার নীচে নিশানাথ ঢুকে গেছেন শুনে তারা গোরুটাকে বাঁচাবার আগে চেঁচাতে থাকে, ও বাবু বেরিয়ে আসেন। আগে আপনি বেরিয়ে আসেন–

নিশানাথ শেষ ঝাঁকুনিটা দিতেই কীসে যেন মট করে একটা শব্দ হল। গাড়িটা উঁচু হয়ে উঠল একসঙ্গে অনেকখানি–এবং বুকের মাঝখানে একটা বাঁশের ডগায় ধাক্কা খেয়ে নিশানাথ ছিটকে পড়লেন মাঠের মধ্যে।

সেখান থেকে তক্ষুনি উঠতে পারলেন না। সুব্রত পাশে এসে ডাকছে, বাবা, বাবা! নিশানাথের চোখ দু-টি স্থির। তিনি ভাবছেন, বাঁশের ডগাটা ভাগ্যিস বুকে লেগেছিল। চোখে মুখে লাগলে কী হত কে জানে! উমা এখানে থাকলে খুশি হত না।

অন্য লোকরা গোরুটাকে টেনে বার করছে। সেটা এখনও চিৎকার করে চলেছে বলেই বোঝা যায় হয়তো বেঁচেই যাবে। নিশানাথ ভাবলেন, তিনিও জীবন ডাক্তারের মতন করে হাসবেন। একটা গোরুর প্রাণ বাঁচানোও কম কথা কী! গোরু তো সাক্ষাৎ ভগবতী!

কিন্তু তিনি হাসতে পারলেন না। তাঁর চোয়াল আটকে গেছে। বুকে যেন অসহ্য ব্যথা।

সুব্রত বাবাকে আস্তে আস্তে তুলে বসালো। ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞেস করল, আপনার লেগেছে? কোথায় লেগেছে?

নিশানাথ দু-দিকে ঘাড় নাড়লেন। অন্য লোকরাও তাকে নানা প্রশ্ন করছে। তিনি কথা বলতে পারছেন না। নিশ্বাস বন্ধ করে ব্যথাটাকে দমাবার চেষ্টা করছেন। তোক ব্যথা, তবু এর তৃপ্তি আছে।

নিশানাথ উঠে দাঁড়াতে পারছেন না। একসঙ্গে তিনি শরীরে অসম্ভব শক্তি কেন্দ্রীভূত করেছিলেন, এখন সব শক্তিই যেন তাঁকে হঠাৎ ছেড়ে চলে গেছে। কাজ শেষ হয়ে গেছে।

তো। কয়েকজন লোক ধরাধরি করে নিশানাথকে দাঁড় করালো।

অদূরে বোরাস্তায় হেডলাইট জ্বালিয়ে এসে একটা বাস দাঁড়াল, নিশানাথ হঠাৎ গা- ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে বললেন, সব ঠিক হয়ে গেছে। চল এইটাই বোধ হয় লাস্ট বাস।

কেউ কেউ পরামর্শ দিল নিশানাথকে একটু বিশ্রাম করে যেতে। তিনি এবার স্বাভাবিকভাবে বললেন, না, না, এখন ঠিক আছি। হঠাৎ বুকে লেগে গিয়েছিল কিনা! খোকন, বাসটা থামা।

নিজেই তিনি হেঁটে এসে বাসে উঠলেন। সৌভাগ্যবশত জায়গা খালি ছিল, তিনি বসলেন জানলার পাশে। তারপর বাহুতে মাথা গুঁজে বললেন, খোকন, আমি একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছি।

ডায়মণ্ড হারবারে বাস এসে পৌঁছোবার পর সুব্রত বাবাকে ডেকে দিল। নিশানাথ মুখ তুলে বললেন, এসে গেছি? চল–

বাস থেকে নামতে গিয়ে নিশানাথ হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন মাটিতে। হা-হা করে লোকজনেরা ঘিরে ধরল তাঁকে। সুব্রত খুব ঘাবড়ে গেল। তার বাবার দায়িত্ব তো তাকে কখনো নিতে হয় নি। কী করবে, বুঝতে পারছে না। বাবা আবার কীসে রাগ করবেন তারও তো ঠিক নেই।

নিশানাথ আবার নিজেই উঠে বসলেন। এখন তার মুখটা ঘোর-লাগা মানুষের মতন। নিজের এই দুর্বলতায় তিনি নিজেই সবচেয়ে বেশি অবাক হয়ে গেছেন। তিনি ফিসফিস করে সুব্রতকে বললেন, একবার জীবনকে খবর দিতে পারিস?

সুব্রত আরও ঘাবড়ে গেল। এখন জীবন ডাক্তারকে খবর দেওয়া কী করে সম্ভব? কাকদ্বীপের দিকে যাওয়ার কি আর বাস আছে? যদি থাকেও, অতদূর গিয়ে আবার নৌকোয় গঙ্গা পেরিয়ে সেখানে পৌঁছোতে তো অনেক সময় লেগে যাবে। এতক্ষণ বাবাকে কোথায় রেখে যাবে সে?

এখানকার কোনো ডাক্তার দরকার নেই। জীবনকে খবর দিতে পারিস না?

সে তো অনেক দূর!

ও!

কাছাকাছি একটা ডাক্তারখানায় ডাক্তারবাবু আজ উপস্থিত ছিলেন না, অন্যদের মুখে খবর পেয়ে কম্পাউণ্ডারবাবুই এলেন খবর নিতে। চারদিকে ভিড় জমে যাওয়া রাস্তার মধ্যে বসে থাকা নিশানাথকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে? মাথা ঘুরে গেছে?

নিশানাথের শরীরের চেয়ে মনের জোর অনেক বেশি। তিনি ধমক দিয়ে বললেন, কিছু হয়নি। এত লোক কেন?

সুব্রতর কাঁধে ভর দিয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। একটা পায়ে জোর নেই, অন্য পা-টা ঠিক আছে। বুকের ওপর বাঁ-হাতটা জোর করে চেপে তিনি ব্যথাটা চাপা দিতে চাইছেন।

সুব্রত বাবাকে সাইকেল-রিকশায় তুলল। স্টেশনে এসে দু-গেলাস জল খেয়ে নিশানাথ অনেকটা সুস্থ বোধ করলেন। রাত্তিরটা ঘুমিয়ে নিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। কাল আবার বাড়িভাড়ার মামলা আছে। হঠাৎ তাঁর মনে হল, বাড়িওয়ালা ওই মামলায় জিতে গেলেই

এখন ভালো হয়। তাহলে নিশানাথ সব ছেড়েছুড়ে জীবনময়ের আশ্রমে চলে আসতে পারবেন অনেক সহজে। এবার আসতে হবেই, আর সংসারে মন বসবে না।

শিয়ালদহ স্টেশনে যখন পৌঁছোলেন, তখন নিশানাথ খুবই দুর্বল বোধ করছেন। শরীরের মধ্যে কোথায় কী যেন একটা কিছু ছিঁড়ে গেছে। একটা পায়ে একদম জোর নেই। এ-রকম হল কেন? তাঁর খুব ইচ্ছে করছে এক্ষুনি একবার জীবনকে দেখাতে। জীবন একবার দেখলেই সব ঠিক হয়ে যেত।

তিনি নিজেই সুব্রতকে বললেন, একটা ট্যাক্সি ডাক। এতে সে অবাক হলেও বাবার শান্ত মুখ দেখে ভাবল, শরীর নিশ্চয়ই এখন ঠিক হয়ে গেছে। জীবন ডাক্তারের কাছে আবার ফিরে যেতে হলেই হয়েছিল আর কী! বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করার জন্য সুব্রত ছটফট করছে। রাত মাত্র সোয়া ন-টা, বাড়ি পৌঁছে এখনও বন্ধুদের কাছে আবার যাওয়া যায়। আজই না শিখার জন্মদিন? গতবছর এইদিন শিখা নেমন্তন্ন করেছিল।

বাড়ির সামনে ট্যাক্সি থেকে নেমে নিশানাথ দেখলেন, একটা পুলিশের গাড়ি দাঁড়িয়ে। সদর দরজা খুলেই দেখলেন দু-জন পুলিশ ইনস্পেকটরের সঙ্গে কথা বলছে সঞ্জয়।

নিশানাথ ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার?

সঞ্জয় তাড়াতাড়ি শ্বশুরকে ঢিপ করে প্রণাম করে বলল, কিছু না, এঁরা এমনি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। চলুন, আমরা একটু বাইরে গিয়ে কথা বলি।

নিশানাথ বাঁ-পা-টা ঘষটাতে ঘষটাতে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন। সব ঠিক হয়ে যাবে, কাল সব ঠিক হয়ে যাবে।

পা-টা ভীষণ ভারী লাগছে। তবু ওপরে উঠতেই হবে। আরও ওপরে। কতদিন আর নীচে পড়ে থাকবেন? এবার সময় হয়েছে, উঠতেই হবে ওপরে। আর কত দূর? আর কত দূর?

২০. ইন্দ্রাণীর বাবা-মা

ইন্দ্রাণীর বাবা-মা এমনকী জড়ভরত কাকাটি পর্যন্ত জেগে উঠেছে। ডাক্তারের বাড়িতে অধিক রাতে তোক ডাকতে আসা আশ্চর্য কিছু নয়, কিন্তু চেঁচামেচি স্বাভাবিক নয়। চাকর দরজা খুলে দিতেই ভাস্কর পাড়ার লোকের কৌতূহলী চোখ যতদূর সম্ভব এড়াবার জন্য তাড়াতাড়ি মণীশের পিঠে ঠেলা দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে দিল।

ইন্দ্রাণীর বাবা বললেন, একী, মণীশ? কী হয়েছে?

ভাস্কর শুকনো গলায় বলল, ও একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

অমরনাথ একটু গম্ভীরভাবে বললেন, তা তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু এই অসুখের জন্য তো কেউ ডাক্তারের কাছে আসে না।

একমাত্র ইন্দ্রাণীই নীচে আসেনি। সীমন্তিনী সিঁড়িতে এসে দাঁড়িয়েছেন। এত রাত্রেও তিনি নেমে আসবার সময় সোনালি ফ্রেমের চশমাটা পরে আসতে ভোলেননি।

মণীশ দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে অল্প অল্প দুলছে। কর্কশভাবে বলল, আমি ইন্দ্রাণীর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

ভাস্কর এমনভাবে অমরনাথের দিকে তাকাল যেন চোখের ভেতর থেকে দুটো হাত বেরিয়ে এসে জোড়া হয়ে ক্ষমা চাইছে। মৃদুগলায় বলল, আমি ওকে আটকাবার চেষ্টা করেছিলাম।

মণীশ আবার বলল, আমি... আমি ইন্দ্রাণীর সঙ্গে দেখা করতে চাই! সে কোথায়?

সীমন্তিনী শান্তভাবে বলল, ঠিক আছে, তুমি বোসা মণীশ, আমি ইন্দ্রাণীকে ডেকে দিচ্ছি।

সিঁড়ির কাছে কয়েকটা লম্বা লম্বা গদিমোড়া বেঞ্চ আর দু-একটা চেয়ার পাতা। একটা গোলটেবিলে কয়েকটা পত্রপত্রিকা ছড়ানো। সকাল বেলা রোগীরা ওইখানে বসে।

ভাস্কর মণীশকে নিয়ে বসাবার চেষ্টা করল। তার হাত ছাড়িয়ে মণীশ নিজেই বসতে গেল একটা চেয়ারে। অমরনাথ ঠিক সময় ধরে না ফেললে সে চেয়ারসুদ্ধই উলটে পড়ে যেত। তিনি একটা ধমক দিয়ে বললেন, বোসো চুপ করে।

মণীশ ঘোলাটে চোখ মেলে ধমকের উত্তর দিয়ে বলল, আমি আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে আসিনি। আপনি চোখ রাঙাচ্ছেন কী! ইন্দ্রাণী কোথায়?

অমরনাথ এবার মৃদুহাস্যে বললেন, একটা সিডেটিভ দিলেই ঠিক হয়ে যাবে!

ভাস্কর তাড়াতাড়ি সিঁড়ির ওপর উঠে গিয়ে বলল, ছোটোমাসি তুমি ইন্দ্রাণীকে এখন ডেকো না।

কেন?

ওর কী এখন মাথার ঠিক আছে? কী যা তা বলবে।

ও কি এমনিতে শান্ত হবে?

মেসোমশাই ওকে ঘুম পাড়িয়ে দেবেন?

মাথাটা বুকের কাছে ঝুঁকে পড়েছিল মণীশের, আবার মাথাটা তুলে হেঁড়েগলায় বলল, কোথায় ইন্দ্রাণী কোথায়? এখানে কি মানুষের সঙ্গে মানুষের কথা বলারও স্বাধীনতা নেই?

ভাস্কর শুধু ব্যাকুলভাবে বলল, ও যা খুশি বলুক। তুমি ইন্দ্রাণীকে ডেকো না।

একবার না-হয় দেখা দিয়ে যাক।

না, না। আমি বারন করছি। ও যা-তা বলবে, তুমি জানো না। এমনসব মিথ্যেকথা বলতে পারে, তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না!

অমরনাথ বললেন, মণীশ, এত রাত্রে বাড়ি ফিরবে কী করে? এই অবস্থায় বাড়ি ফেরা যায়?

আমার কোনো বাড়ি-ফাড়ি নেই। আমি হোটেলে যাব। কারুর বাবার হোটেল নয়!

আজ রাতটা তুমি এখানেই শুয়ে থাকবে।

ভাস্কর সীমন্তিনীকে বলল, ছোটো মাসি, তুমি ওপরে যাও! ওই তো মেসোমশাই বললেন —আমি আর উনি দু-জনে মিলে ওকে ঠিক ঘুম পাড়িয়ে দেব।

সঙ্গে সঙ্গে ভাস্কর মুখ তুলে দেখল, ওপরের সিঁড়িতে ইন্দ্রাণী দাঁড়িয়ে। হয়তো অনেক আগে থেকেই দাঁড়িয়ে আছে। সে হাত নেড়ে ইশারায় বলল, তুমি চলে যাও, তুমি চলে যাও।

ইন্দ্রাণী শুনল না, নেমে এল। একেবারে মণীশের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সে রাত-পোশাক পরেছিল, তার ওপরেই একটা শাড়ি জড়িয়ে এসেছে।

মণীশ তাকে দেখল কয়েক মুহূর্ত অপলকভাবে। যেন চোখের সামনে একটা পর্দা, সেটা সরাবার চেষ্টা করছে হাত দিয়ে। তারপর বলল, কে, ইন্দ্রাণী? আমায় চিনতে পারছ?

ইন্দ্রাণী বলল, হ্যাঁ।

না, চিনতে পারছ না। বাজেকথা। ঠিক করে বলল, চিনতে পারছ?

হ্যাঁ।

ফের বাজে কথা? এই কি আমার চেহারা?

তোমার কী হয়েছে মণীশ?

মণীশ? আমার নাম মণীশ নয়, আমার নাম দেবদাস, হ্যা, হ্যা, হ্যা, হ্যা।

তীব্র চিৎকারে হাসতে লাগল মণীশ। এ-রকম মজা যেন সে বহুদিন পায়নি। হাসতে হাসতেই বলল, তোমার বাবা-মা শকড, তাই না? হ্যা হ্যা হ্যা হ্যা। শোনো, তোমাকে আমি বলতে এসেছি, আমি তোমার কেউ না! আমি কেউ না তোমার

অমরনাথের ঠোঁটেও হাসি। তিনি রসিক পুরুষ। কখনো মুখ গোমড়া করে থাকেন না। ইতিমধ্যে তিনি একটা ইঞ্জেকশন তৈরি করে এনেছিলেন। ফিসফিস করে বললেন, দেবদাসই বটে!

তারপর জোরে বললেন, বাঃ, কথা শেষ হয়ে গেছে তো,। ডান হাতটা ধর তো!

ভাস্করই সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত নেমে এসে মণীশের একটা হাত চেপে ধরল। মণীশ তখনও বলল, আমি তোমার কেউ না। এই যে, এই ছোকরা, এই যে ভাস্কর, তুমি ওর দিকে তাকাচ্ছ না কেন? আমি বলছি, ও–

ইঞ্জেকশনটা প্যাট করে ঢুকে যেতেই মণীশ বিকট চিৎকার করে উঠল। তারপর অমরনাথের দিকে এমনভাবে তাকাল যেন খুনই করে ফেলবে। কিন্তু সে আর কিছু বলার আগেই ভাস্কর তার মুখে হাত চাপা দিল।

অমরনাথ বলল, ওকে এই বেঞ্চটায় শুইয়ে দাও!

সীমন্তিনী জিজ্ঞেস করলেন, ওখান থেকে পড়ে যাবে না?

একটু পরে ঘরের মধ্যে শুইয়ে দিলেই হবে। জুতোটা খুলে দিলে ভালো হয়। জামার বোতামগুলোও।

ভাস্কর নীচু হয়ে মণীশের জুতোর ফিতেয় হাত দিতেই মণীশ বলল, আমি বাড়ি যাব!

বাড়ি?

আমার যেখানে খুশি।

আজ আর নয়, কাল সকালে।

মণীশের শরীর অবশ হয়ে আসছে, আর জোর করতে পারছে না। নিজেই এলিয়ে পড়ল বেঞ্চে। বিড়বিড় করে বলতে লাগল, কেউ না, কেউ না। কেউ না।

সে একেবারে ঘুমিয়ে পড়তে ভাস্কর অমরনাথের দিকে তাকিয়ে বলল, খুব স্যাড, এত ব্রাইট ছেলে ছিল। শিলং-এ গিয়ে বাজে লোকজনের সঙ্গে মিশে মিশে

ইন্দ্রাণী তখনও দাঁড়িয়ে আছে। তার দিকে তাকিয়ে বলল, ওকে আটকাবার যে কত চেষ্টা করেছি, প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে।

অন্য সবাই কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। কেউই যেন মণীশের প্রসঙ্গে কোনো কথা বলতে চায় না। ভাস্কর ইন্দ্রাণীর দিকে ভয়ে ভয়ে আড়চোখে তাকাল।

ইন্দ্রাণী বলল, বুগোনদা, তুমিও থেকে যাও!

ভাস্কর শশব্যস্ত হয়ে বলল, অসম্ভব। বাড়িতে কোনো খবর দেওয়া নেই, বাবা-মা এতক্ষণ কী যে ভাবছেন! আমাকে এক্ষুনি যেতে হবে।

ভাস্করের মুখের দীন কাঁচুমাচু ভাবটা কেটে গেছে, বরং খানিকটা উৎফুল্ল, কারণ সে শেষমুহূর্তে মণীশের মুখে হাত চাপা দিতে পেরেছিল।

মোটরবাইকের গর্জন তুলে ভাস্কর চলে গেল।

অমরনাথ চাকরের সাহায্য নিয়ে মণীশকে ধরাধরি করে এনে শুইয়ে দিলেন বসবার ঘরের টেবিলের ওপর। সীমন্তিনী বললেন, একটা বালিশ নিয়ে আয় তো ওপর থেকে।

টেবিলের ওপর হাত-পা ছড়ানো অবস্থায় মণীশের লম্বা চেহারাটা পড়ে রইল। পা দুটো একটু বাইরে বেরিয়ে এসেছে। ঝুলেপড়া একটা হাত সীমন্তিনী তুলে দিলেন বুকের ওপর। আলোটা নিভিয়ে দিতে দিতে অমরনাথ বললেন, কাল আটটার আগে আর ওর ঘুম ভাঙবে না।

বাইরে বেরিয়ে এসে সীমন্তিনী মেয়েকে বললেন, তোর মন খারাপ লাগছে?

ইন্দ্রাণী ফ্যাকাসেভাবে হাসল। তারপর বলল, না, মন খারাপ হবে কেন? আমি তো জানতাম!

অমরনাথ বললেন, এক-একজন মানুষের এ-রকম হয়। নিজেকে ধ্বংস করার একটা নেশায় পেয়ে বসে।

ওপরে যে-যার ঘরে শুতে চলে গেল। ইন্দ্রাণীর এখন ঘুম আসবে না। অনেকটা নিয়মরক্ষার মতন সে একটা বই খুলে রাখল বুকের ওপর। প্রতিটি শব্দ সে বানান করে পড়তে শুরু করল, যে করে হোক মন বসাতেই হবে। আশ্চর্য, মণীশের চেয়ে ভাস্করের কথাই তার মনে পড়ছে বেশি। ভাস্করের নীরব বিষণ্ণ মুখ। মণীশকে সে কখনো বিষণ্ণ হতে দেখেনি। ইন্দ্রাণী যখন মণীশকে সব কিছু দিতে চেয়েছিল, তখনও ভাস্করের জন্য তার মনের মধ্যে একটা ব্যথা ব্যথা ভাব হত।

ইন্দ্রাণী আর একটা কথা ভেবেও অবাক হল। মণীশ যতই বদলে যাক, শুধু তাকে একবার চোখের দেখাতেই যে সে এত আনন্দ পাবে, সে তা জানত না। নীচে নেমে গিয়ে সে যখন মণীশের সামনে দাঁড়াল, সে তখন এত নেশাগ্রস্ত যে মানুষই বলা যায় না। তবু, তাকে সেই অবস্থাতে দেখেও ইন্দ্রাণীর শরীরে একটা চাপা আনন্দ বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। তিন বছর বাদে, শুধু চোখের দেখা।

ভোররাত্রির দিকে ইন্দ্রাণী আবার বেরিয়ে এল ঘর থেকে। ঘুম যখন আসবেই না, তখন আর শুধু শুধু শুয়ে থেকে লাভ কী! শেষরাত্রির গাঢ়ঘুমে সারাবাড়ি নিস্তব্ধ। ইন্দ্রাণী নেমে এল নীচে।

মণীশের পাশে দাঁড়িয়ে দেখল সে ঠিক একভাবেই শুয়ে আছে। হঠাৎ দেখলে মনে হয় শরীরে প্রাণ নেই। ইন্দ্রাণী তার বুকে হাত রাখল, নিশ্বাসে দুলছে ঠিকই এবং উষ্ণ শরীর।

মণীশের চিবুকে হাত রেখে ইন্দ্রাণী ডাকল, এই, এই!

কয়েকবার তাকে ধরে ঝাঁকাতেও সে জাগল না। জাগবেও না এখন। সে এখন ওষুধে নিদ্রিত।

ইন্দ্রাণী মণীশের ঠোঁটে, গালে, গলায় হাত বুলোতে লাগল। বেশ রোগা হয়ে গেছে মণীশ, সে টের পায়। হাড়গুলো বেরিয়ে এসেছে। বুকের জামাটা অনেকখানি ফাঁক করে বুকটা দেখতে লাগল। তারপর ইন্দ্রাণী সেখানে এমনভাবে হাত বুলোতে লাগল যেন সে একটা স্লেটের ওপর থেকে লেখা মুছে দিতে চাইছে। মণীশ বলেছিল।...

মোটা বেল্ট পরে আছে মণীশ। বেল্টটা আলগা করে দিল ইন্দ্রাণী, তারপর চোখের পাতায় আলতো করে হাত বুলোতে লাগল, যদি সে জাগে। কিছুতেই জাগল না। যেন টেবিলের ওপর শুয়ে আছে চুম্বকে তৈরি এক নীরব দেবতা।

আবার অবাক হল ইন্দ্রাণী। মণীশকে শুধু ছুঁয়েই তার এত আনন্দ? তিন বছর পর, সামান্য একটু স্পর্শ, তাও চেতনাহীন শরীরে, তাতেই ইন্দ্রাণীর ভেতরটা ঝনঝন করে বাজছে। নিজে থেকে সে তো মণীশকে কখনো কিছু দেয় নি। এখন মণীশ কিছু জানবে না বলেই সে তাকে আদরে আদরে ভরিয়ে দিল। চুমু খেল ঠোঁটে, গলায়, বুকে। মণীশের হাতটা তুলে রাখল নিজের বুকে। অসহ্য ভালো লাগায় তার যেন দমবন্ধ হয়ে আসছে। মণীশের পায়ে সে চেপে ধরল তার মুখ।

একটু পরে ইন্দ্রাণী মণীশের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

২১. বাড়ি পৌঁছোবার পর সুব্রত

বাড়ি পৌঁছোবার পর সুব্রত যখন দেখল জামাইবাবু এসেছেন, তখন সে বুঝল একটু রাত পর্যন্ত হইহল্লা হবেই। সে দিদিকে বলল, আমি একটু ঘুরে আসছি।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে সুব্রত প্রথম গেল অনিন্দ্যদের বাড়িতে। তাকে বাড়িতে পেল না। তারপর গেল বৃতিকান্তর কাছে। সে-ও বাড়িতে নেই। তারপর সে তাদের নির্দিষ্ট চায়ের দোকানে, ইউনিয়ন অফিসে ঘুরে এল—কোথাও কেউ নেই। আজ সবাই একসঙ্গে কোথায় গেল? বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়ার যখন দারুণ ইচ্ছে হয়, তখন কারুকে পাওয়া না গেলে মনে হয় সমস্ত পৃথিবী তার বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র করছে। গত দু-দিন ধরে সুব্রত কারুর সঙ্গে মুখ খুলে ভালো করে কথাই বলতে পারেনি। জ্বর জ্বর ভাবটা কলকাতায় এসেই কেটে গেছে।

তখন তার ক্ষীণ সন্দেহ হল, তাহলে সবাই কি শিখার বাড়িতে গেছে? শিখার আজ জন্মদিন, সে-সম্পর্কে সুব্রতর কোনো সন্দেহ নেই। গতবছর শিখা নেমন্তন্ন করেছিল। এ-বছর তো করেনি। কিংবা এ-বছর শিখা অন্যদের নেমন্তন্ন করে তাকে বাদ দিয়েছে? হতেও পারে। শিখা সব পরীক্ষা দিয়েছে, সে দেয়নি। শিখা পাশ করবেই। কয়েক মাস পরেই শিখা ইউনিভার্সিটিতে চলে যাবে। সুব্রতকে ফিরতে হবে কলেজে—অনেক তফাৎ হয়ে যাবে। সুব্রতর বুকটা মুচড়ে উঠল। এ-রকম ভুল মানুষে করে! তখন খেয়াল হয়নি যে অন্যরা এগিয়ে চলে যাবে! যদি কোনো টাইম-মেশিনে একটা বছর আগে চলে যাওয়া যেত, তাহলে সুব্রত এমনভাবে পড়াশুনো শুরু করত যাতে অনিন্দ্যদের বিট দেওয়া যায়।

শিখাদের বাড়িটা বেশ দূরে। তবু সুব্রত একবার সেখানে না গিয়ে পারল না। অন্তত এইটুকু এখনও দেখা দরকার, শিখা তাকে সত্যিই বাদ দিয়েছে কি না। শিখাদের বাড়ির উলটো দিকে একটু অন্ধকার মতন জায়গা দেখে সুব্রত দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল।

শিখাদের বাড়ির সামনে দু তিনটে গাড়ি দাঁড়িয়ে। বোঝা যায়, ভেতরে অনেক লোকজন। গতবছর শিখা শুধু নিজেদের বন্ধুদেরই নেমন্তন্ন করেছিল, খুব বেশি লোকজন তো ছিল না। এবার কি আত্মীয়স্বজনদেরও বলেছে? কিংবা শিখার বন্ধুর সংখ্যা বেড়ে গেছে, শুধু বাদ পড়ে গেছে সুব্রত।

অভিমানে সুব্রতর বুকটা ভারী হয়ে আসে। পৃথিবীতে তার আর কোনো বন্ধু নেই। কেউ তার কথা মনে রাখেনি। অনিন্দ্যরাও তো শিখাকে বলতে পারত, কী রে সুব্রতটাকে এবার বলিসনি?

অনিন্দ্য কি এসেছে? ধৃতি? সুব্রত নিজেই শিখাদের বাড়িতে এখন ঢুকে পড়তে পারে না? যেন তার জন্মদিনের কথাটা মনে নেই, এমনিই শিখার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। কিন্তু সুব্রত তা পারবে না। এমনিভাবে একা এসে দেখা করবার অধিকার শিখা তো তাকে দেয়নি।

একটু বাদে দেখা গেল অনিন্দ্য আর দেবযানী মশলা চিবোতে চিবোতে বেরিয়ে আসছে। যাতে ওরা তাকে দেখতে পায়, তাই সুব্রত আরও দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল। অনিন্দ্য আর দেবযানী দু-জনেই খুব হাসছে। ওদের ঝগড়া ছিল না? অনিন্দ্যটা দেবযানীর কাঁধে হাত রাখল। ওরা বড়োরাস্তার দিকে না গিয়ে উলটো দিকে হাঁটছে। তার মানে যোধপুর পার্কে ওরা বেড়াবে।

তাহলে প্রমাণ হয়ে গেল, শিখা তাকে বাদ দিয়েছে। অনিন্দ্যও বেমালুম ভুলে গেছে তাকে। নাকি শিখা তার বাড়িতে গিয়ে খোঁজ করেছিল? মাকে কিছু বলে এসেছিল? কিছুই তো জিজ্ঞেস করেনি।

আরও কারা যেন বেরোচ্ছে! সুব্রত দেখল তার সামনে কয়েকটি ভিখিরি ছেলে-মেয়ে জড়ো হয়েছে। ওরা এসেছে উচ্ছিষ্টের ললাভে। সুব্রতও কী ওদের মতন? সে কী দাঁড়িয়ে আছে শিখাকে এক পলক দেখবার জন্য!

সুব্রত আর দাঁড়াল না। হনহন করে হাঁটতে লাগল বাসরাস্তার দিকে। তার চোখ এখন বিস্ফারিত। ঘরের কোণঠাসা বেড়ালের মতন রাগি হয়ে উঠছে সে। চোয়াল শক্ত। মনে মনে বিড়বিড় করে বলছে, দেখে নেব, সব শালাকে দেখে নেব।

সারারাস্তা ধরে সুব্রত মনে মনে ওই কথা বলতে বলতে ফিরল। মাঝে মাঝে তার মনে পড়ছে, প্রবল ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে সে নৌকোর হাল ধরেছিল। শেষপর্যন্ত পেরেছিল তো, বাবা পর্যন্ত স্বীকার করেছেন। এই সুব্রতই আজ থেকে দশ বছরের মধ্যে ভারতের নেভাল অ্যাডমিরাল জেনারেল, সাদা পোশাক, নীল স্ট্র্যাপ লাগানো টুপি, দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী তাকে ডেকে পাঠাচ্ছে... যুদ্ধ লেগেছে, সাবমেরিনের মধ্যে সুব্রত... বড়োলাকের মোটকা গিন্নি হয়ে শিখা আর দেবযানী তখন খবরের কাগজে সুব্রতর ছবি দেখবে আর প্রতিবেশীদের কাছে গর্ব করে বলবে, ছাত্রবয়েসে একে আমি চিনতাম।

বাড়ি ফিরে দেখল, সকলের খাওয়া হয়ে গেছে। যথারীতি তার খাবার ঢাকা রেখে মা বসে আছেন। বাবা কিছু না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়েছেন। জামাইবাবুর আনা মিষ্টি আর আম খেতে হল সুব্রতকে। একটুও রুচি নেই। কতক্ষণে সে ওপরে নিজের ঘরে যাবে।

ওপরে এসে সে সিগারেট ধরিয়েই ফিজিক্স বই খুলে বসল। এখন থেকে প্রতিরাত্রে অন্তত তিন ঘণ্টা পড়বে। সামনের বছর সে সব শালাকে দেখিয়ে দেবে! যাক-না ওরা এক বছর এগিয়ে, এখনও তো সারাজীবন পড়ে আছে।

সকাল বেলা অনেক ডাকাডাকিতে সুব্রতর ঘুম ভাঙল। মাত্র সাড়ে ছটা বাজে। সে অনেকক্ষণ ঘুমোবে ভেবেছিল। মণি বলল, ছোটোমামু, শিগগির নীচে এসো। দিদু তোমাকে ডাকছেন।

বাবুর ঘরে সবাই ভিড় করে আছে, শিয়রের কাছে মা। ঘরের মধ্যে পা দিয়েই সুব্রতর বুক কেঁপে উঠল।

নিশানাথ সাংঘাতিক অসুস্থ। তিনি হাত, পা কিছুই নাড়তে পারছেন না। চোখ দুটি বিস্ফারিত। গলার আওয়াজ ফ্যাসফেসে। তিনি বলছেন, আমাকে তুলে ধরো! আমাকে দাঁড় করাও।

একজন বিরাট শক্তিমান পুরুষ নিজের হাত-পা-ও নাড়াতে পারছেন না, দৃশ্যটি এমনিই করুণ যে অন্য সবাই নির্বাক। সুব্রত বিশ্বাসই করতে পারছে না। কাল বাবার বুকে চোট লেগেছিল, কেন কাল ডায়মণ্ড হারবারেই সে ডাক্তার দেখায়নি! কিন্তু বাবার অমতে কিছু কি করা যায়?

হয়তো নিশানাথ এখনও হুকুমই দিতে চাইছেন, গলার আওয়াজ যে বদলে গেছে তা নিজেও জানেন না।

সুব্রতর চোখে চোখ রেখে নিশানাথ বললেন, আমাকে তুলে দে। একবার তুলে দিলেই আমি যেতে পারব। আমাকে যেতেই হবে! কথা দিয়েছি।

মা বললেন, খোকন, শিগগির একজন ডাক্তার ডাক। নিশানাথ এই কথাটা শুনতে পেলেন। তিনি বললেন, জীবনকে খবর দাও। অনেক কথা আছে।

সুব্রত আর দেরি করল না। জীবন ডাক্তারকে খবর পাঠানোর কথা পরে চিন্তা করলেও চলবে। একজন যেকোনো ডাক্তার দরকার।

পাড়ার ডাক্তারখানাটা এখনও খোলেনি। ডাক্তারবাবুর বাড়ি অনেক দূরে। এখন সকাল সাতটা, এখন কোথায় ডাক্তার পাওয়া যাবে? হাসপাতালে যাবে কি! তারপরেই সুব্রতর মনে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা বাসে উঠে পড়ল।

ইন্দ্রাণীদের বাড়িতে তখনও দরজা খোলেনি। রোগীরা আসতে শুরু করে আটটা থেকে। সুব্রত বার বার বেল বাজাতে লাগল। চাকর দরজা খুলতেই সে বলল, ডাক্তারবাবু উঠেছেন? আমার বিশেষ দরকার। না-হলে ইন্দ্রাণীকে খবর দাও, উনি আমাকে চেনেন।

চাকর বলল, বসুন, খবর দিচ্ছি।

লম্বা বেঞ্চটায় বসল সুব্রত। সামনেই একটা দরজা খোলা। টেবিলের ওপর শুয়ে আছে একজন মানুষ। খাড়া নাক আর চিবুকের খানিকটা অংশ দেখেই সুব্রত যন্ত্রের মতন উঠে চলে এল। ভালো করে দেখে শিউরে উঠল একেবারে। দাদা!

আর চিন্তা করারও সময় পেল না, সুব্রত দু-হাত দিয়ে ধাক্কা দিতে লাগল মণীশকে। পাগলের মতন চেঁচাতে লাগল, দাদা, দাদা, দাদা–

মণীশের একটু আগে ঘোর কেটেছে। তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব। চেঁচামেচিতে অত্যন্ত বিরক্তি হয়ে খেকিয়ে উঠল, কেন চেল্লাছিস?

দাদা, আমি খোকন!

খোকন তো তাতে কী হয়েছে? চেল্লাচ্ছিস কেন এত?

শিগগির ওঠো! বাবার খুব অসুখ।

মণীশ পকেটে হাত দিয়ে সিগারেট খুঁজল। এ-পকেট, ও-পকেট খুঁজেও না পেয়ে ভুরু কোঁচকাল। তারপর ধড়মড় করে উঠে বসে বলল, কে?

আমি খোকন।

মণীশ নিজের ছোটো ভাইকে এবার ভালো করে দেখল। আর কিছু বলল না।

এতক্ষণে সুব্রত জিজ্ঞেস করল, তুমি এখানে?

না। বাবার খুব অসুখ, ভীষণ অসুখ।

তোর বাবার তো কখনো অসুখ হয় না। অত ঘাবড়াচ্ছিস কেন?

সুব্রতর মুখের ওপর যেন একটা চাবুক পড়ল। এই দাদা ছিল তার ছেলেবেলার হিরো!

মণীশের চোখ দুটো এখনও টকটকে লাল। চুলগুলো উশকোখুশকো, জামায় ছোপ ছোপ ময়লা লেগে গেছে। মুখখানা ফ্যাকাশে, এখনও নেশা ঠিকমতন কাটেনি, কথা বলার সময় বিশ্রি গন্ধ বেরোচ্ছে।

অমরনাথ দেরি করছেন কেন, সেটা দেখবার জন্য সুব্রত দরজার দিকে এগিয়ে গেল। মণীশ ডেকে জিজ্ঞেস করল, এই শোন, কী হয়েছে?

প্যারালিসিস!

অমরনাথ আর ইন্দ্রাণী একসঙ্গেই নেমে এসেছে। সব শুনে অমরনাথ বললেন, আমি গাড়ি বার করছি। মণীশকে তৈরি হয়ে নিতে বলো!

মণীশ কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, আমি গিয়ে কী করব?

ইন্দ্রাণী ছুরির মতন চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি যাবে না?

প্যারালিসিস হয়েছে তো, আমি গিয়ে কী করব? আমি তো বলেই দিয়েছি, কারুর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই! কারুর সঙ্গে না!

সুব্রত বলল, ইন্দ্রাণীদি, দেরি হয়ে যাচ্ছে।

তোমায় যেতে হবে না! তুমি থাকো তোমার অভিমান নিয়ে। চলো সুব্রত

ওর ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর মণীশ টেবিল থেকে নামল, জামার বোতামগুলো আটকাল, বেল্টটা ঠিক করল, তারপর হাঁটতে গিয়ে দেখল তার তখনও মাথা ঘুরছে। তবু বেরিয়ে এল ঘর থেকে, সেইসময় চাকর এক কুঁজো জল ভরে আনছিল, তার হাত থেকে কুঁজোটা নিয়ে মণীশ প্রায় অর্ধেকটা জল খেয়ে ফেলল ঢকঢক করে। জল গড়িয়ে ভিজে গেল তার জামা। তারপর বেরিয়ে এল বাইরে।

অমরনাথ তখন গাড়িতে স্টার্ট দিচ্ছেন। মণীশ অনুমতি না নিয়েই সামনের দরজা খুলে বসে পড়ল ভেতরে। ঘাড় ফিরিয়ে ইন্দ্রাণীর দিকে তাকিয়ে বলল, অভিমান নয়।

ওরা যখন পৌঁছোলো, তখন ঘরের মধ্যে স্পষ্ট মৃত্যুর ছায়া। অমরনাথ গম্ভীর হয়ে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, কখন থেকে এ-রকম হয়েছে?

সুব্রত বলল, কাল সন্ধ্যে থেকেই বুকে ব্যথা।

এরমধ্যে কোনো ডাক্তার দেখানো হয়নি?

রাজি হননি।

অমরনাথ নিশানাথের পাশে হাঁটুগেড়ে বসে পড়ে বললেন আপনি কি মানুষ?

নিশানাথ কিছু কথা শুনতে পাচ্ছেন না। তাঁর কানের কাছে অসম্ভব জোর একটা ঘর্ঘর শব্দ। তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারছেন, দরজার মধ্যে দুটো ঘুণপোকা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছে। দুটো ঘুণপোকা আসছিল দু-দিক থেকে। মাঝপথে দেখা হয়েছে, একজন জিজ্ঞেস করল, সব ঠিক আছে তো? অন্যজন উত্তর দিচ্ছে, সব ঠিক। চলছে, চলবে। কী সাংঘাতিক জোরালো তাদের কণ্ঠস্বর।

তিনি কথা বলতে পারছেন না। চোখ দুটে খোলা। তিনি দেখলেন, সামনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে তাঁর জামাই আর বড়ো ছেলে। ঠিক যেন দুই যমদূত। মণীশ এল কোথা থেকে? কে তাকে ডেকেছে? কেউ ওকে দূর করে দিচ্ছে না কেন? ও কি দয়া দেখাতে এসেছে? চেহারা দেখলেই বোঝা যায়, অধঃপাতের শেষসীমায় গেছে! ও যেন কী বলতে চাইছে, ঘুণপোকারা ঢেকে দিচ্ছে ওদের কথা।

জামাইটাও বদলে গেছে। কাল ওর কাছে পুলিশ এসেছিল। সভ্য, ভদ্র, সৎ লোকের কাছে পুলিশ আসে না। এবার বাড়িটা তছনছ করে দেবে। মেয়েদের কে দেখবে? সব গেল।

একবার যদি এরা কেউ তাঁকে তুলে দাঁড় করিয়ে দিতে পারত! সিল্কের জামা পরেছে সঞ্জয়, ঠিক লম্পটদের মতন। এর ওপর অনেকের আশা ছিল। চালচলন একেবারে বদলে গেছে– মণীশ এসে গেছে, এবার ওদের মিলবে ভালো। যদি এখনও এ-দুটোকেই দূর করে দেওয়া যেত! সঞ্জয়ও কী যেন বলতে চাইছে। ঘুণ দুটোর কথা কি ওরা কেউ শুনতে পাচ্ছে না? একবার যদি কেউ তাঁকে তুলে দাঁড় করিয়ে দিত, তিনি দরজাটাই ভেঙে আগুনে গুঁজে দিতেন।

আধ ঘণ্টা বাদে অমরনাথ সরে এসে বললেন, আর কষ্ট দিয়ে লাভ নেই।

সুব্রত তখন তার দাদা আর জামাইবাবুকে ভেদ করে সামনে এসে খাটের পাশে মাটিতে বসে পড়ে ব্যাকুলভাবে বলল, বাবা, আমি জীবনকাকার কাছে ফিরে যাব, আমি কথা দিচ্ছি।

নিশানাথ সে-কথাও বুঝতে পারলেন না। ঘুণ দুটোর শব্দ আরও প্রবল হয়ে উঠে সব কিছু ঢেকে দিচ্ছে। কান ঝালাপালা হওয়ার উপক্রম। ছোটো ছেলের মেলে দেওয়া হাতটার দিকে তাকিয়ে তাঁর শুধু মনে হল, এর হাতে এখনও ময়লা লাগেনি। কিন্তু আর কতদিন!

বুকের মধ্যে যেন একটা কুমির বারবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে চাইছে। নিশানাথের ব্যথা বোধ অনেক কমে গেছে। কিন্তু তার ক্ষীণ সন্দেহ হচ্ছে, বুঝি তার চোখে জল। এই কুলাঙ্গারদের সামনে তিনি চোখের জল ফেলবেন? প্রাণপণ চেষ্টা করলেন, হাতটা তুলে চোখের জল মুছে ফেলার জন্য।

বড়ো একটা নিশ্বাস ফেলার আগে, নিশানাথ পৃথিবীর সব মানুষের মতনই ভাবলেন, জীবনটা যদি গোড়া থেকে আর একবার শুরু করা যেত।